সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী
BanglaBook.org
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

"শ্রীমান তারাশিসকে ছেলেবেলায় দেখেই জ্ঞানগঞ্জের মহাসাধক বহেরা বাবা আমায় বলেছিলেন — যোগীবাবা আপকা ইয়ে লেড়কাভী যোগী হোগা। আজ সেই ভবিষ্যদবাণী প্রমাণিত সত্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস — তারাশিস তার ঐশীকৃপাধন্য লেখনীর মাধ্যমে বহু ভক্ত মানুষকে যুগযুগান্ত ধরে নিয়ে যাবে মুক্তির দিশায়।" — **শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (মহাপীঠ তারাপীঠ, অলৌকিক লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-স্বামীজী সহ বহু গ্রন্থের লেখক)**

"Tarashis Gangopadhyay is a gifted author of several Bengali books and has a wide readership of his publications that covers his unique experience of meeting great sages and saints in the Himalayas during his travels and treking. He is spiritually highly elevated and has been instrumental in awakening many people in the path of light and love," — **Sri Sri Shuddhaanandaa Brahmachari. (President of Loknath Divine Life Mission and author of many books.)**
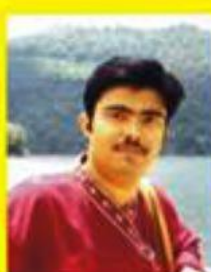
তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা অধ্যাত্ম সাহিত্যের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ছেলেবেলা থেকেই আধ্যাত্মিক জগতের সাথে যুক্ত। সেই সময় থেকেই সাধক পিতা শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল সাধিকা মাতা শ্রীমতি মীরা গঙ্গোপাধ্যায় এবং অগণিত সিদ্ধ সাধক সাধিকার অমৃতময় সান্নিধ্য তাঁর মননশীল জগৎকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মহামণ্ডলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজের পত্রিকা "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা"-য় লেখকের প্রথম ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী "দিব্যধাম পুরীতে রথযাত্রা" প্রকাশিত হয়ে বিশেষ সম্মান লাভ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি অর্জনকারী এই সাধক লেখক যোগ ও ভক্তির পথে নিজ মুক্তির সাথে সাথে সকল ভক্তদেরও পরমের পথে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে নিয়োজিত। এই মানবকল্যাণের ব্রতে তাঁর ঐশীকৃপাসম্পন্ন লেখনীই মুখ্য মাধ্যম। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে"। তারপর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর একের পর এক আধ্যাত্মিক মহাগ্রন্থ — দেবলোকের অমৃতসন্ধানে (চার পর্বে সমাপ্ত — যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখ পর্ব, বাসুকীতাল-কালিন্দী খাল-বদ্রীনাথ পর্ব, পঞ্চবদ্রী-পঞ্চপ্রয়াগ-পঞ্চকেদার পর্ব, নেপাল পর্ব), অতীন্দ্রিয় জগতের আহ্বান, বৃন্দাবনে আজো ঘটে অঘটন, জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে, কাশীধামে আজো ঘটে অঘটন, শ্যামের মোহন বাঁশী, ক্ষণিক খোঁজে চিরন্তন (তিন পর্বে সমাপ্ত — মধ্যপ্রদেশ পর্ব, নাসিক-শিরডি-দ্বারকা প্রভাস পর্ব, দক্ষিণ ভারত পর্ব), আজো লীলা করেন সাই, FROM THE WORLD BEYOND DEATH, জন্মান্তর, মহাপ্রভুর নীলাচলে আজো চলে লীলা, অনন্তের জিজ্ঞাসা (৩ খণ্ডে সমাপ্ত), কেদারনাথে আজো ঘটে অঘটন, যেথা রামধনু ওঠে হেসে, আজো সেথা নিত্য লীলা করেন গোরা রায়, জীবন থেকে মহাজীবনের পথে এবং সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী। প্রতিটি গ্রন্থই সাধুসমাজ, পাঠকসমাজ তথা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা কর্তৃক বিরাট সমাদর লাভ করে। এই গ্রন্থগুলিতে আজো নিত্য ঘটমান অলৌকিক লীলার উপর রচিত অবিস্মরণীয় সত্যঘটনাগুলি লেখককে যেমন আপামর জনসাধারণের আরো কাছে নিয়ে এসেছে তেমনই পাঠক-পাঠিকাদেরও অবিরত সাহায্য করে চলেছে তাঁদের আত্মোপলব্ধির পথে — জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণের লক্ষ্যে। এইভাবেই লেখক বর্তমানে জগৎ ও জীবের কল্যাণে আপন ঐশীনির্দিষ্ট ব্রতে একান্তভাবে নিয়োজিত।

ISBN No. : 978-93-82325-15-4

লেখকের **Website :**
Http://spiritualbooksoftarashisgangopadhyay.blogspot.in

সাংগ্রীলার গুপ্তযোগী

(মহাযোগী রেচুং লামার সান্নিধ্যে এক গুপ্তযোগীর তিব্বতের উচ্চকোটির যোগী মহাত্মাদের নিভৃত সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলা দর্শনের এবং সেখানকার নিবিড় যোগসাধনার অনুপম অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকর সত্যনিষ্ঠ বিবরণ)

তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়

জয় মা তারা পাবলিশার্স
কলকাতা - ৭০০ ০৬৮

SANGRILAR GUPTOYOGI

by **Tarashis Gangopadhyay**

(This book is the mystic narrative of a great Tibetan Lama who visited the secret Buddhist Gompha of Sangrila, hidden away in the valleys of remote Tibetan plateau with a highly evolved soul and mahayogi Rechung Lama.He had also enlightened the author with the minute details of his experience of the Yogsadhna of Sangrila he performed there to achieve sidhhi.)

উৎসর্গ

সাংগ্রীলার যে গুপ্তযোগীর অপার করুণায় সেখানকার কিছু বিশিষ্ট গুপ্তক্রিয়া লাভ করে ধন্য হয়েছি আমি, যাঁর কৃপায় জগতে প্রথমবারের জন্য তিব্বতের গুপ্ত সাধনপীঠ সাংগ্রীলা ও সেখানকার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে অবগত হয়েছি সেই সুমহান লামাকে এই গ্রন্থটি সানন্দে ও সকৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গ করলাম।

— ইতি

লেখক

ভূমিকা

সমস্ত পৃথিবীর অধ্যাত্মজগতের প্রাণকেন্দ্র দেবতাত্মা হিমালয়ের গহন কন্দরে অবস্থিত তিব্বতের গভীরে রয়েছে যোগবিজ্ঞানের সুপ্রাচীন সাধনক্ষেত্র জ্ঞানগঞ্জ। সাধারণ মানুষ এই নিভৃত গুপ্ত সাধনভূমির কথা বিশেষ একটা জানেন না। তবে এই অপার্থিব সাধনপীঠ জ্ঞানগঞ্জের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অভূতপূর্ব কর্মযজ্ঞের কথা যুগ যুগ ধরে জানেন ভারতবর্ষের উচ্চকোটির যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ। পরম স্রষ্টার ঐশীনির্দিষ্ট বিধানে এই জ্ঞানগঞ্জ থেকেই ঈশ্বরকোটির যোগী মহাত্মারা সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের অবিরাম ক্রিয়াচক্র সুনির্দিষ্টভাবে চালনা করছেন ; সূর্য্যবিজ্ঞান, চন্দ্রবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যাত্ম যোগবিজ্ঞানসমূহের অমোঘ প্রয়োগে তাঁরা সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি নীরবে নিভৃতে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে।

এই জ্ঞানগঞ্জের নিয়ন্ত্রণে তিব্বতে ও ভারতের গহন কন্দরে বেশ কিছু গুপ্ত সাধনপীঠ রয়েছে যেখানে যোগ ও তন্ত্রের সাধনা চলছে নিভৃতে নিরন্তরভাবে। এইসব সাধনপীঠের অধিকাংশই রয়েছে চতুর্থ আয়ামের অন্তর্গত। এই স্থানগুলি যেহেতু বায়ুশূন্যতা ও ভূশূন্যতার সাথে যুক্ত তাই এসব সাধনপীঠ দেশ-কাল-পাত্রের সীমার অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তাই তৃতীয় আয়াম বা থার্ড ডাইমেনশনের প্রাণীদের চোখে এই স্থানগুলি ধরা দেয় না। ফলে এখানকার নিভৃত ক্ষেত্রে সানন্দে সাধনমগন থাকেন অনেক গুপ্তসাধক। পৃথিবীর বুকে এমন গুপ্ত সাধনক্ষেত্র বেশ কিছু রয়েছে। তারই অন্যতম হল সাংগ্রীলা পাসের বিজন প্রদেশের বৌদ্ধ গোম্ফা। সাংগ্রীলা পাসের নামেই সেই গোম্ফা বা মঠের নামকরণ। সেখানে আজো সকলের নিভৃতে মঠাধ্যক্ষ রেচুং লামা তাঁর শতাধিক অনুগামীকে নিয়ে যোগ ও তন্ত্রের সাধনায় নিয়োজিত আছেন আর জ্ঞানগঞ্জের নির্দেশ অনুসারে সেখানকার যোগীদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী যোগী ও তান্ত্রিকদের উন্নতিকল্পেও কাজ করে চলেছেন পরম আনন্দভরে।

এই সাংগ্রীলারই এক লামা ২০১৩ সালে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন অদ্ভুতভাবে। সেদিন সতীপীঠ কালীঘাটের মাতৃমন্দিরে বসে জপ করছিলাম আমি আপনমনে। সেইসময়েই লামার আবির্ভাব হয়। একরকম জোর করেই আমাকে ধ্যান থেকে উঠিয়ে তিনি আমাকে দিয়ে তাঁর সেবা করান আর তারপর আমাকে দেন বেশ কয়েকটি গুপ্ত ক্রিয়া যা পরবর্ত্তীকালে আমার ক্রিয়াসিদ্ধিতে বিশেষ

সহায়ক হয়েছে। সেইসময়েই আমি জানতে পেরেছিলাম যে তাঁর সাধনক্ষেত্র হল সাংগ্রীলা। তিব্বতের এই গুপ্ত সাধনক্ষেত্রের নাম আমার অজানা ছিল না। বিভিন্ন সাধু মহাত্মাদের কাছে শুনেছিলাম সেখানকার উল্লেখ। কিন্তু সেই বিষয়ে সবিশদ জানা ছিল না কিছু। তাই লামার কাছে জানতে চেয়েছিলাম সেখানকার সাধনপ্রণালীর কথা। কিন্তু তখন গুরুর নির্দেশ না থাকার জন্য তিনি আমাকে সে বিষয়ে অবহিত করতে পারেননি। তবে তিনি বলেছিলেন — সৎ প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না। তাই গুরুর আদেশ পেলে অবশ্যই তিনি রাখবেন আমার অনুরোধ।

অতএব প্রতীক্ষায় ছিলাম আমি দীর্ঘদিন। অবশেষে ২০১৫ সালে সেই লামার সাথে আবার হল আমার ফিরে দেখা অদ্ভুতভাবে। ততদিনে তিনিও পেয়ে গেছেন গুরুর নির্দেশ। তাই সানন্দেই তিনি আমাকে খুলে বললেন সাংগ্রীলার কথা, সেখানে তাঁর যোগসাধনার কথা এবং সেইসঙ্গে জানালেন — কিভাবে তাঁর বিজ্ঞানসাধনার গুরুজী তথা আমার পূর্ব পরিচিত মহাত্মা জ্ঞানানন্দজীর নির্দেশে তিনি আমার সাথে সংযোগস্থাপন করেছেন। সেইসাথে তিনি খুলে বললেন আমায় সাংগ্রীলার নিভৃত গুপ্তযোগের প্রতিটি অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। শুনতে শুনতে শিহরিত হয়ে উঠছিলাম আমি। সাংগ্রীলার এক গুপ্তযোগীর থেকে সেখানকার গুপ্ত তথা রহস্যময় যোগের সকল প্রণালীর এমন সহজ সরল বিবরণ আমার আগে আর কেউ যে এভাবে শ্রবণ করেননি তা বলাই বাহুল্য। অতএব গুপ্ত সাধনপীঠ সাংগ্রীলার যোগসাধনার প্রতিটি পর্য্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং সেখানে লামার অভিজ্ঞতা ও সাধনকথা ঠিক যেমনটি শুনেছি তেমনটিই আমি লিখে দিলাম এই গ্রন্থে আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্য। এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমাকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতি শাশ্বতী দাশ মহাশয়া। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এই গ্রন্থ পাঠ করে যাতে সকলে তিব্বতের রহস্যময় গুপ্তপীঠ সাংগ্রীলার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন এবং সেইসাথে সেখানকার গুপ্তযোগের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবগত হন সেজন্যই আমার এই গ্রন্থরচনার প্রয়াস। (তবে গ্রন্থে বর্ণিত এই প্রক্রিয়াগুলি কেউ নিজে অনুশীলন না করে কোন যোগীগুরুর সান্নিধ্যে থেকে অনুশীলন করবেন। নাহলে হিতে বিপরীত হওয়াও বিচিত্র নয়।)

গুপ্ত সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলা এবং সেখানকার গুপ্তযোগ প্রসঙ্গে রচিত এই গ্রন্থটি যদি আমার অন্যান্য গ্রন্থের মত পাঠক-পাঠিকাদের মনে অনাবিল আনন্দ সঞ্চার করতে পারে তবেই জানব সার্থক হয়েছে আমার গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

—লেখক

এক

জ্যোৎস্নারাত। হাল্কা কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ী পথ। লাচেন গ্রাম পেরিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে হাঁটছি লামা আংডেন ক্যাম্পের লক্ষ্যে। উদ্দেশ্য — প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে তার অনাবিল সৌন্দর্য্য উপভোগ। আপনমনে পাহাড়ী বনপথের মনভোলানো দৃশ্যরাজি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। বর্তমানে প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন : আকাশের গায়ে মাথা এলিয়ে চারপাশের পাহাড়শ্রেণীও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। নীরব নিরালা এই বনপথের পাশের বার্চ আর ফারের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে একটানা ঝিঁঝির ডাক। সেই শব্দ যেন নিরালা পথের নির্জনতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে দিচ্ছে। অচেনা বুনোফুলের সুবাসে সুরভিত পথ। সাথে কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত ; ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটায় শিরা উপশিরার রক্তও জমে যাবার উপক্রম হয়েছে। এহেন পরিবেশে গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে একলা বনপথ ধরে চলেছি আমি লামা আংডেন ক্যাম্পের লক্ষ্যে।

সত্যি বলতে কি, আমার এই পথ চলা যেন জীবাত্মার চিরন্তন পথ চলারই প্রতীক। আমরা প্রতিটি মানুষই তো পথিক — জীবনপুরের পথিক। জন্ম থেকে চলছে অবিরত পথ চলা। জানি না — এ পথের শুরু কোথায়। জানি না — এ পথের শেষ কোথায়। শুধু জানি — এ পথে থামার কোন উপায় নেই। শুধু এগিয়ে যেতে হবে। তবে এ পথ বন্ধুর হলেও বন্ধুবিহীন নয়। পথই সময়ের সাথে সাথে জুটিয়ে দেয় বন্ধু ;· আবার পথই সময়ের সাথে সাথে কেড়ে নেয় বন্ধু। বন্ধু আসে, বন্ধু যায় — কিন্তু বন্ধুর পথ চলা অব্যাহত থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে এই অনন্ত পথ চলা। মৃত্যুতে আসে যাত্রার বিরতি। তারপর আবার জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে নতুন দেহে ফিরে এসে আবার নামতে হয় পথে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অবিরাম পথ চলার ধারাবাহিকতা আবার নতুনভাবে শুরু হয় নতুন আঙ্গিকে।

সেই অনন্তেরই লক্ষ্য আমায় কুহকের মত ফিরে ফিরে ডাকে। তাই তো দু দণ্ড বসতে পারি না ঘরে। শান্ত গৃহকোণ আমার মুসাফির মনকে বেঁধে রাখতে পারে না। পথের টানে বেরিয়ে আসি আমি। এবারও ঘটেনি ব্যতিক্রম।

প্রকৃতির টানে এবার এসেছি সিকিম হিমালয়ে — সিকিম সরকারের পারমিট

নিয়েই এসেছি ৫৮৬৮ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট বিজন পর্বতশিখর লামা আংডেনের অনাবিল সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরে উপভোগ করার লক্ষ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্যেই গতকাল গাড়িতে গ্যাংটক থেকে এসেছি লাচেন গ্রামে। গত রাতে লাচেন গ্রামেই ছিলাম। বৃষ্টিভেজা রাতে গতকাল পড়েছিল হাড়কাঁপানো শীত। লেপের আরামে অবশ্য মন্দ কাটেনি সেই দুরন্ত শীতের রাত। আজকে সকালে প্রাণভরে লাচেন গ্রামের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছি। অতঃপর মধ্যাহ্নভোজ সেরে দুপুর দুটো নাগাদ বেরিয়েছি লামা আংডেন ক্যাম্পের লক্ষ্যে। লাচেন থেকে লামা আংডেনে পৌঁছতে ঘন্টা ছয়েক লাগে। প্রথম দিকের পথটা বেশ সুন্দর। পাহাড়ী বনপথের পাশে লাচুং-চু নদীর তিরতির করে বয়ে চলা, ফার-বার্চের জঙ্গলে বাতাসের মর্মর, বনপথ দিয়ে চকিতে বন্যজন্তুর ছুটে পালানো — সব মিলিয়ে চলতে চলতে নিজের মাঝে নিজেই যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম।

দেখতে দেখতে পথ হয়ে উঠতে লাগল রুক্ষ। বনপথের সবুজ মায়া গেল হারিয়ে ; আলগা নুড়িপাথরের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগলাম উপরপানে। সময়ের সাথে তাল রেখে পথে নেমে এল অন্ধকার। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ যেন প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত মনে হতে লাগল। প্রকৃতির অখণ্ড বিস্তারের মাঝে একলা পথিক আমি এগিয়ে চললাম। আশেপাশে কোথাও জনবসতির দেখা নেই। ফলে রাত কাটানোর জায়গারও অভাব। তাই এ পথে থামবার যো নেই — এগিয়ে যেতেই হবে ; আজ রাতেই আমাকে পৌঁছতে হবে লামা আংডেন ক্যাম্পে।

কিন্তু দেখলাম যত সময় যাচ্ছে তত মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে সামনের পথ। জ্যোৎস্না ও মেঘ মিলেমিশে তৈরী করছে এক অদ্ভুত আবছায়ার খেলা। কয়েক হাত দূরের বস্তুও কেমন যেন অস্পষ্ট ঠেকছে। হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হল। ফোঁটা ফোঁটা দিয়ে শুরু ; ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল বৃষ্টিধারার শক্তি। এদিকে রুক্ষ পাহাড়ী চড়াই পথে কোথায়ই বা দাঁড়াই? এখানে যে কোথাও গাছপালার চিহ্নও নেই। অতএব বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলাম উপরপানে।

সহসা ডানদিকে দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা আলোমত দেখা গেল। এই নিরালা পাহাড়ী পথে আলো? তবে কি আশেপাশে কেউ আছেন? আমি দ্রুতপায়ে অগ্রসর হতে লাগলাম সেদিকপানে। একটু এগোতেই দেখি — পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট গুহা। এসব গুহা অবশ্য রাতের বেলায় একেবারেই নিরাপদ নয়। বন্যজন্তু

থাকার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। কিন্তু এই গুহার ভিতর থেকে যে আলো ভেসে আসছে। অতএব বুঝতে অসুবিধা হল না — নিশ্চয় ভিতরে কোন মানুষজন আছে। আর এদিকে বৃষ্টির তোড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব তার থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

গুহাটি একটু প্রশস্ত। ভিতরে দেখলাম জ্বলছে ধুনি। আর ধুনির সামনে একজন মুণ্ডিতমস্তক লামা বসে আছেন। পরণে লাল গাউন। তাঁর গায়ের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে একটি বড় সাপ। লামা কিন্তু নির্বিকার। দু'চোখ বন্ধ। স্পষ্টই বুঝলাম — তিনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। আমি তাঁর ধ্যান ভাঙালাম না। শুধু হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে নীরবে প্রণাম জানালাম। বাইরে ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

আমার প্রণাম পেয়ে লামা চোখ খুললেন না ঠিকই। তবে আমি প্রণাম করে ওঠামাত্র হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে সামান্য তুলে স্পষ্ট বাংলায় বললেন, "কি খোকাবাবু, কেমন আছ? ক্রিয়াগুলো ঠিকমত করছ তো?"

চমকে উঠলাম আমি। খোকাবাবু? এই সম্বোধনটি তো আমার অপরিচিত নয়। কণ্ঠস্বরটিও তো অচেনা নয় আমার। আবার ভাল করে চাইলাম লামার দিকে। তবে কি? হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছি। ইনিই সেই গুপ্তযোগী যাঁর সাথে ২০১৩ সালে কালীঘাট মন্দিরপ্রাঙ্গণে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেইসময়ে তিনি আমাকে জগৎকল্যাণের জন্য বেশ কিছু ক্রিয়া দিয়েছিলেন যা আমি এখনো নিত্য অনুসরণ করি।

এই লামার সাথে আমার সেই প্রথম দেখার ঘটনাটি বাস্তবিকই আমার জীবনের এক মাইলস্টোন। এমন অভাবিতভাবে যে এহেন উচ্চস্তরের যোগীর কৃপা পাওয়া যেতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর অভাবিত প্রাপ্তি যখন বাস্তবে রূপ নেয় তখনই তো মন অনুভব করে কৃপার মহিমা। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। মহাপীঠ কালীঘাটেই আমি পেয়েছিলাম সেই কৃপা। এমনিতে আমাদের বংশ শাক্ত বংশ। সেই সুবাদে যা দক্ষিণাকালীর বীজমন্ত্র আমাদের নিত্য জপ করতে হয়। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি গোপালের উপাসক কিন্তু বাবাই ছেলেবেলায় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাধনপথে এগোনোর মূল সূত্র। বাবা বলেছিলেন — মহামায়ার কৃপা না পেলে কৃষ্ণের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এ পথে অগ্রসর হতে

হলে যে প্রথমেই চাই কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী মায়ের আশীষ। তাই কৃষ্ণের পথে এগোতে হলেও শুরুতে ভক্তের ধরতে হয় মাকে। মাকে প্রসন্ন করতে পারলে তবেই মেলে কৃষ্ণভক্তি। সেই ভক্তি দিয়ে কৃষ্ণের অর্চনা করলে তবেই লাভ হয় তাঁর কৃপা। তাই শ্যামের লক্ষ্যে যাওয়ার জন্যও বাবা প্রথমে আমায় শ্যামাসাধনার পথই দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

বাবা বরাবরই বলেন — সিদ্ধ বীজমন্ত্র যদি কোন মহাপীঠে বসে জপ করা যায় কায়মনোবাক্যে তবে তাতে ইষ্টদেবী সবচেয়ে প্রসন্ন হন। আর আমাদের কলকাতায় মহাপীঠ হল কালীঘাট। তাই ছেলেবেলা থেকেই কালীঘাটে আমার আনাগোনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর ভক্তদের বলতেন, 'শনি-মঙ্গলবারে মায়ের কাছে যাবি। ওই দুইদিন মা খুব প্রসন্ন থাকেন।' অতএব কলকাতায় থাকলে প্রতি শনি-মঙ্গলবারেই আমি যাই মাতৃদর্শনে। মাকে পুজো দিয়ে সব পার্শ্বদেবদেবীদের প্রণাম জানিয়ে চলে যাই মায়ের ভৈরব নকুলেশ্বরের কাছে। সেখানে পুজো দিয়ে তবেই শেষ হয় আমার শনি-মঙ্গলবারের আরাধনা।

তবে প্রতি শনি-মঙ্গলবার তো কলকাতায় থাকি না আমি। সেবারও বিশেষ কারণে শনিবারে আমার কলকাতার বাইরে যাওয়ার প্রোগ্রাম পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে মাতৃদর্শনের একটি দিন তো প্রাণে ধরে ছেড়ে দেয়া যায় না। অতএব শনিবারে মন্দিরে যেতে না পারার দুঃখ ভুলতে তার আগের দিনটিই আমি বেছে নিয়েছিলাম মাতৃদর্শনের জন্য। আর মা তো সন্তানের দিকে সদাই লক্ষ্য রাখেন। হয়তো তাই তিনি আমার শনিবারে আসতে না পারার বিষাদ ভুলিয়ে দেবার জন্য সেদিনই আস্বাদ করালেন এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা।

সেদিন যথারীতি অন্যান্যদিনের মতই গর্ভগৃহে মা কালীকে পূজা দিয়ে এসে বসেছিলাম নাটমন্দিরে। এই নাটমন্দিরটি বাংলা ১২৪১ সনে আন্দুলের জমিদার কাশীনাথ রায় নির্মাণ করিয়েছিলেন। অনেক পাণ্ডারা এখানেই ভক্তদের পূজা করিয়ে দেন। অনেক ভক্ত আবার নাটমন্দিরে বসে জপও করেন ; কেউ বা করেন চণ্ডীপাঠ। আমিও শনি-মঙ্গলবারে মন্দিরে এসে এঁদেরই একপাশে কোন একটি কোণ দেখে বসে যাই জপে। এদিনও তার অন্যথা হয়নি। নাটমন্দিরের পিছনদিকে একপাশে ফাঁকা দেখে বসে গিয়েছিলাম জপে। এই মহাপীঠে মহাসিদ্ধ বীজমন্ত্রের জপ দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে ছড়িয়ে দেয় এক আলাদা আবেশ। বিশেষতঃ পূরক গ্রহণের পর

কুম্ভক করে সেই বীজমন্ত্র যখন আজ্ঞাচক্রে জপ করা হয় তখন তার দৈবী অনুরণন সারা দেহে ছড়িয়ে দেয় এক অপার্থিব আনন্দের জোয়ার। সেদিনও জপ করতে করতে সেই আনন্দের অনুরণনেই পূর্ণ হয়ে ছিলাম আমি। ভাবের আবেশে হারিয়ে গিয়েছিলাম নিজেরই মাঝে।

এভাবে জপ করতে করতে সেদিন যে কতক্ষণ কেটেছিল ঠিক খেয়াল নেই। নিজের মাঝেই নিজে তন্ময় হয়ে ছিলাম আমি। কিন্তু জপে হঠাৎই এল বিঘ্ন। সহসাই কাছ থেকে কানে এল এক গুরুগম্ভীর স্বর, "ও খোকাবাবু, শুনছ?"

বলাই বাহুল্য — প্রথম ডাকে আমি সাড়া দিইনি কোন। কারণ তখন আমার বয়স ৪১। আর এই ৪১ বছর বয়সে কেউ যে আমাকে 'খোকাবাবু' ডাকতে পারে এতো আমার কল্পনারও অতীত। মনে হয়েছিল — আশেপাশে আরো তো অনেকেই আছে ; হয়তো তাদের উপরই বর্ষিত হচ্ছে এই সম্বোধন। অতএব যেমন জপের মধ্যে ডুবেছিলাম তেমনই ডুবে রইলাম।

কিন্তু বেশীক্ষণ শান্তিতে জপ করা গেল না। একটু পরই আবার কানের কাছে বেজে উঠল একই কণ্ঠস্বর, "কিগো খোকাবাবু, শুনতে পাচ্ছ না?"

এবারও সম্বোধনে সাড়া দিলাম না। বরং কানের কাছে বারবার এই কণ্ঠস্বরের উৎপাতে একটু বিরক্তই হলাম। আসলে জপের সময়ে সামান্যতম বিঘ্নও যে ভাল লাগে না। সমস্ত মনপ্রাণ ইষ্টে নিবেদিত রেখে কুম্ভক করে জপে মনোনিবেশের মধ্যেই যে নিহিত থাকে জপের আসল আনন্দ। আর সেই আনন্দে ব্যাঘাত এলে খুবই বিরক্তি জাগে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার সাড়া না দেয়ায় তৃতীয়বারে সেই কণ্ঠস্বরের মালিকের থেকে বেশ কড়াসুরেই ধমক খেতে হল আমায়, "এই যে খোকাবাবু, বারবার ডাকছি। শুনতে পাচ্ছো না? বই লেখার ব্যাপারে যেমন সপ্রতিভ তুমি তেমনটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে নও কেন? কালীকে ডেকে ডেকে নিজে কালা হয়ে গেলে নাকি?"

এহেন তিরস্কারে আমার টনক নড়ল। তাহলে কি 'খোকাবাবু' বলতে তবে আমাকেই বোঝানো হচ্ছে? ২০১৩ সালে সেইসময়ে আমার আঠেরোটি বই প্রকাশিত হয়ে গেছে। উনিশতম বইটি যন্ত্রস্থ। তাই বই লেখার উল্লেখ শুনে মনে হল উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বোধহয় আমিই। অতএব এরকম তিরস্কার শুনে জপ থামালাম।

মনে মনে মা কালীর উদ্দেশ্যে জপ নিবেদন করে জানালাম প্রণাম। তারপর চোখ মেলে চাইলাম। তখন দেখি — আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এই মুণ্ডিতমস্তক লামা। বয়স আমার চেয়ে বেশী বলে মনে হল না। ভুটিয়াজাতীয় গড়ন। সুঠাম দেহ। বড় বড় দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখে পলকও পড়ছে না। বুকে ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে গেরুয়া রঙের গাউন।

আমি চোখ মেলে চাইতেই তিনি কড়া গলায় বলে উঠলেন সম্পূর্ণ সরল বাংলায়, "তোমাকেই ডাকছিলাম খোকাবাবু। কথা আছে যে।"

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চাইলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা?"

আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর কঠোরতা রূপ নিল কোমলতায়। তিনি মৃদু হেসে বললেন, "সে তো বলবই। কিন্তু তার আগে যে তোমাকে আমার সেবা করতে হবে। আগে কিছু খাওয়াও। বিনা সেবায় কি মেওয়া মেলে?"

ওঃ! তবে এই কথা? এজন্য আমার জপ ভাঙালেন লামা? মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম। তবে মনের বিরক্তি মুখে প্রকাশ করলাম না। পকেট হাতড়ে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! লামা সেদিকে চেয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'টাকা দিচ্ছ কেন? ও দিয়ে আমি কি করব?"

আমি বললাম, "এই টাকাটি দিয়ে মন্দিরের বাইরে গিয়ে যেকোন দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিন।"

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "সে তুমি কিনে খাওয়াও। আমি খামোকা টাকা নিতে যাব কেন? ওসব আমার ধরতে ভাল লাগে না।"

বটে? টাকা ধরতে ভাল লাগে না! অথচ অন্যকে জপ থেকে তুলে খাওয়াতে অনুরোধ করতে ভাল লাগে! বেশ বিরক্তই হলাম আমি। আর সেই বিরক্তির ভাব মুখে ফুটিয়েই বললাম, "দেখছেন তো — আমি জপ করছি। এখন আমার উঠতে ইচ্ছা করছে না। তাই টাকাটা আপনার হাতেই দিয়ে দিচ্ছি। মন্দিরের উল্টোদিকেই একটি মিষ্টির দোকান আছে। আপনি টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে কিছু কিনে খেয়ে নিন। সেটা কি আপনি পারবেন না?"

—"না পারব না। বা বলা ভাল — পারতে চাইব না।" মিটিমিটি হাসতে

হাসতে বললেন লামা, "কারণ এমনটি করলে তোমাকে দিয়ে সেবা করানো তো হবে না। আর সাধুসেবার মূল্য না দিলে যা আজ তোমায় দিতে আমি এসেছি তা তো দেয়া যাবে না।"

—"তার মানে? আপনি আবার আমায় কি দেবেন?"

—"সেই দেয়ার জন্যই তো আমার আজ আসা। আমি এখানে এসেছি তোমাকে কিছু দিতে এবং তা তোমার মাধ্যমে জগৎব্যাপী ছড়িয়ে দিতে। আমি জানি — তুমি ক্রিয়াযোগী, নিত্য ক্রিয়া কর। কিন্তু মূল ক্রিয়াযোগ ছাড়াও ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভের স্তরে পৌঁছনোর জন্য আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত ক্রিয়া আছে যা নানা কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে পৃথিবী থেকে। ওই ক্রিয়াগুলি ঠিকমত করতে পারলে তা পরাবস্থা লাভের পথে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। আর সেই ক্রিয়া তোমার আধারেরও অনুকূল। তাই আমার বিজ্ঞানসাধনার গুরুজীর নির্দেশে সেই ক্রিয়া তোমাকে দেখিয়ে দিতে এখানে এসেছি আমি। ওগুলি তোমার নিজের ভিতরে জাগাতে পারলে প্রথমে তোমার এবং পরে জগতের বিরাট কল্যাণ হবে। কিন্তু কিছু দক্ষিণা না নিয়ে তো এমন যোগক্রিয়া দেয়া যায় না। বিনা দক্ষিণায় যে যোগের ফলই পাবে না তুমি। তাইতো তোমাকে দিয়ে আমার সেবা করানোর চেষ্টা করলাম যাতে তুমি যোগের ফল লাভের যোগ্য হও।"

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে থাকি লামার দিকে। ওনার সাথে তো আমার কোন পরিচয়ই নেই। অথচ উনি আমার সম্বন্ধে যা যা বললেন সবই সত্য। তবে কি সত্যিই উনি আমাকে কিছু গুপ্ত ক্রিয়া দিতেই এসেছেন? লামার প্রতি এবার আগ্রহ জাগল আমার। অতএব জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু এই গুপ্ত ক্রিয়াগুলি আপনি আমাকেই বা দেবেন কেন? আমার সাথে তো আপনার পরিচয়ও নেই। তাহলে আমাকে এই অনুগ্রহ করার কারণ কি?"

—"কারণ — বর্তমানে পৃথিবীতে এই গুপ্ত ক্রিয়াগুলির জন্য নির্দিষ্ট আধারের অভাব। সাধারণভাবে সব আধারের জন্য সব ক্রিয়া নয়। যে আধার ক্রিয়াবান হওয়ার যোগ্য সেই আধারেই ক্রিয়া দিতে হয়। আবার সব ক্রিয়াবানের আধারও সব ক্রিয়া নেয়ার জন্য নয় ; বিশেষতঃ পরাবস্থা লাভের পথে যে ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় সেই স্তরে কিছু কিছু ক্রিয়া আছে যা কোটিতে গোটিকের বেশী পায় না। ফলে সময়ের সাথে সাথে এসব গুপ্ত ক্রিয়া লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে

জাগতিক জগৎ থেকে। অথচ পরাবস্থা লাভের লক্ষ্যে এগোনোর জন্য ওই ক্রিয়াগুলি খুবই জরুরী। আর তুমি তো নিষ্ঠাবান ক্রিয়াযোগী। যথাযোগ্য সময় দিয়ে নিত্য ক্রিয়া কর। তাছাড়া ভবিষ্যতে ক্রিয়ার প্রসারে তুমিও যে জগতে বিশেষ ভূমিকা নেবে তাও আমাদের অবিদিত নেই। তাই আমার বিজ্ঞানসাধনার গুরুজীর নির্দেশেই আমি এসেছি তোমার কাছে।"

—"কে আপনার গুরুজী?"

—"মহাত্মা জ্ঞানানন্দজী।"

জ্ঞানানন্দজীর নাম শুনতেই চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মহাত্মার ছবি। ইতিপূর্বে পঞ্চকেদার ভ্রমণের সময়ে রুদ্রনাথের পথে জ্ঞানানন্দজীর সাথে আমার প্রথম আলাপ হয়। সেইসময়ে তাঁর বিরাট জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর তাঁর সাথে আবার আমার ফিরে দেখা হয় শতপন্থ তালের তীরে। সেই অভিজ্ঞতার কথা আমার 'জ্ঞানগঞ্জের অমৃতলোকে' গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না। তবে জ্ঞানানন্দজীর নাম শুনেই বুঝলাম — এই লামা সাধারণ কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নন ; বিশেষ কারণ ছাড়া আমার কাছে আসেননি উনি। আর ক্রিয়ার সাথে আমার যোগ তো ছেলেবেলা থেকেই রয়েছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব আমাকে নিয়ে এসেছেন ক্রিয়াযোগের পথে। সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে আমার ক্রিয়াযোগ সাধন। আস্তে আস্তে ক্রিয়ার একের পর এক স্তর অতিক্রম করে এসে পৌঁছেছি আজকের জায়গায়। কিন্তু যোগশাস্ত্রের ক্রিয়াসমূহ তো সুবিশাল সমুদ্রের মত। আমরা যাঁরা ক্রিয়াযোগের পথে আছি তাঁরা লাহিড়ী মহাশয়ের চারটি স্তরের ক্রিয়ার কথাই জানি। কিন্তু তার বাইরে আরো যে কত গুপ্তক্রিয়া আছে তার খোঁজ আমরা জাগতিক জগতের কতজনই বা রাখি! তবে কোন গুপ্ত ক্রিয়াই তো লুপ্ত হয় না পৃথিবী থেকে। সব ক্রিয়াই তো সযত্নে সুরক্ষিত আছে যোগীদের পরম পীঠস্থানস্বরূপ জ্ঞানগঞ্জে। এই সাধক যে জ্ঞানানন্দজীর কথা বললেন তিনি তো জ্ঞানগঞ্জে ঘুরেও এসেছেন বলে জানি ; তাই সেই ক্রিয়া তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। আর তাঁরই শিষ্য যখন এভাবে এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে সেই ক্রিয়ার কথা বলছেন তখন তাঁর সম্বন্ধে অবিশ্বাস করাই তো বোকামি।

অতএব আর বিলম্ব না করে সেদিন উঠে পড়লাম। লামার সাথে কালীঘাট

মন্দির থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের মিষ্টির দোকান রসধারা সুইটস-এ গেলাম। সেখান থেকেই লামার জন্য কচুরী ও অমৃতি কিনে নিলাম। লামা সেখানে বসেই সানন্দে সেগুলির সদ্ব্যবহার করলেন। সেই অবসরেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে জ্ঞানানন্দজীই কি আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে?"

—"ঠিকই ধরেছ।"

—"কিন্তু তাঁর কাছে তো আমার কোন ফটোগ্রাফ ছিল না। আর আমার ঠিকানাও জানতেন না তিনি। তাহলে আমার সন্ধান তিনি আপনাকে দিলেন কিভাবে?"

—"খুব সহজে। আমরা যাঁরা সাংগ্রীলা মঠে সাধনা করি তাঁরা সবাই উঁচুস্তরের যোগী। আর তিব্বতের গুপ্ত যোগসাধনা তন্ত্রসাধনা ও ক্রিয়াসাধনা আমাদের সাংগ্রীলাসহ তিব্বতের সকল গুপ্তমঠে শেখান জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মারা। পৃথিবীর যোগ, তন্ত্র ও ক্রিয়ার প্রাণকেন্দ্র সেই জ্ঞানগঞ্জে বর্তমানে সাধনা করেন গুরুজী জ্ঞানানন্দজী। তাই বুঝতেই পারছ — যোগের উচ্চতম অবস্থায় তাঁর অবস্থান। এই অবস্থা যাঁরা সাধনার মাধ্যমে আয়ত্ত্ব করেন তাঁরা হন ত্রিকালদর্শী। জগতে কোথায় কি হচ্ছে, যোগের পথে কারা কতদূর অগ্রসর হচ্ছে তা আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি রাখলেই তাঁরা জানতে পারেন। আর এভাবে যাঁদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হয় তাঁদের ছবি তাঁরা আমাদের আজ্ঞাচক্রে দেখিয়ে দেন। তারপর সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে নেয়া তো সহজ কাজ। কারণ তখন আজ্ঞাচক্রে মনোসংযোগ করলেই যে আজ্ঞাচক্রে তাঁদের বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যত সবকিছু ভেসে ওঠে। তাই গুরুজীর নির্দেশে যখন সাংগ্রীলা থেকে তোমার খোঁজে বেরোলাম তখন তোমায় খুঁজে পেতে আমার এতটুকু অসুবিধা হয়নি।"

লামার কথা শুনে চমকে উঠলাম আমি। তিব্বতের সাংগ্রীলা মঠের নাম তো অনেক সাধকের কাছেই শুনেছি আমি। যোগ তথা ক্রিয়া তথা তন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান এই সাংগ্রীলা। কিন্তু এই স্থান সম্বন্ধে সবিশদ তো জানতে পারিনি কোনদিন। সেই চির রহস্যময় সাংগ্রীলা থেকে এসেছেন এই লামা? আর তিনি যখন স্বয়ং জ্ঞানানন্দজীর-শিষ্য তখন তাঁর কৃপা পাওয়া তো বেশ ভাগ্যের কথা। কিন্তু প্রশ্ন হল — জগতে তো কম যোগী নেই। তাঁদের পরিবর্তে আমারই বা এই কৃপালাভের সৌভাগ্য হল কেন? সেসব যোগীরা প্রায় সবাই-ই আমার চেয়ে অনেক নাম-

খ্যাতি এবং শক্তিসম্পন্ন। তবে এই কৃপা তিনি তাঁদের কেন করলেন না? লামাকে প্রশ্নটা করেই ফেললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু জ্ঞানানন্দজী এই গুপ্তক্রিয়া শেখানোর জন্য আমাকেই বা কৃপা করলেন কেন? জগতে যোগাচার্য্য বা ক্রিয়াচার্য্য তো বড় কম নেই। আর তাঁদের শিষ্যসংখ্যাও প্রচুর। তাই এসব গুপ্তক্রিয়া তাঁরা জানতে পারলে তো এগুলি সবার মাঝে ছড়িয়েও দিতে পারতেন অনেক কম সময়ে। তাহলে জ্ঞানানন্দজী সেরকম আচার্য্যদের কাছে আপনাকে না পাঠিয়ে আমার মত শিক্ষার্থীর কাছে পাঠালেন কেন?"

—"দেখ খোকাবাবু, যাঁরা ক্রিয়ার পথে ইতিমধ্যেই শিক্ষক হয়ে গেছেন তাঁদের আর নতুন করে কি শেখাব? শিক্ষকদের মধ্যে শেখার আগ্রহ কি আর অবশিষ্ট থাকে? তাঁদের শেখাতে গেলে ভাববেন — তাঁদের জ্ঞানকে বুঝিবা পরীক্ষা করা হচ্ছে। আর যাঁর মধ্যে একবার বোধ ঢুকেছে যে তিনি সব জেনে গেছেন তাঁর জানার পরিধীতে যে ওখানেই পড়ে যায় কাঁটাতারের বেড়া। তাই তাঁদের কিছু জানানোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বেছে নেয়াই ভাল ; কারণ একমাত্র তাদের মধ্যেই থাকে জানার ও শেখার আগ্রহ। মূলতঃ সেজন্যই তোমার কাছে গুরুজী আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে এই ক্রিয়াগুলি প্রথমে তুমি নিজে যথাযথ আহরণ করতে পারো আর তারপর নিজে এতে সিদ্ধ হয়ে তা ছড়িয়ে দিতে পারো যথার্থ যোগ্য আধারে। একমাত্র তাহলেই ক্রিয়ার এই গুপ্ত অধ্যায়গুলি জগৎ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে না।"

—"কিন্তু আমি যে আদৌ এই ক্রিয়া গ্রহণের যোগ্য তাই বা বুঝলেন কিভাবে?"

—"বুঝলাম যেহেতু দেখলাম — তোমার মধ্যে জাগতিক যশ-খ্যাতির চাহিদা নেই। নেই সাধনশক্তি দেখিয়ে অপরকে আকর্ষণ করে নিজের অনুগামী বৃদ্ধির ইচ্ছা। নেই তোমার মধ্যে দম্ভ, অহংকার বা লোভ। শুধু আছে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে সাধনে শরণাগত হয়ে থাকা আর সাধনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ ব্যাকুলতা। মূলতঃ যাঁদের মধ্যে এমন ভাব আমরা দেখতে পাই তাঁদেরই জ্ঞানগঞ্জের নির্দেশে আমরা কৃপা করি।"

—"কিন্তু আমি তো এখন সবে লাহিড়ী মহাশয় নির্দেশিত স্থির বায়ুর ক্রিয়ার স্তর পেরিয়ে চতুর্থ তথা শেষ ক্রিয়া সহস্রারের ক্রিয়ায় প্রবেশ করেছি এবং হংসমুদ্রার সাহায্যে সেই ক্রিয়া করছি। তাই এখনই কি গুপ্ত ক্রিয়া আহরণের প্রক্রিয়া শেখা

আমার পক্ষে সমীচিন হবে?"

—"দেখ, এই ক্রিয়াগুলি ষটচক্র সাধনশেষে সহস্রারের ক্রিয়ার আগেই করতে হয়। সেজন্যই গুরুজী এইসময়েই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে। গতজন্মে তুমি যে তন্ত্রসিদ্ধ ছিলে তা আমার অজানা নয়। যোগের পথেও তুমি প্রায় শেষ স্তরে পৌছে গেছিলে। এই ষটচক্র সাধনের শেষে তুমি পরাবস্থালাভের দোরগোড়ায় এলেও সময়ের অভাবে তোমায় সেবার পরাবস্থার আগের স্তরেই থেমে যেতে হয়েছিল। আর তাই যোগের পরাবস্থা তোমায় আয়ত্ত্ব হয়নি গতজন্মে। সেজন্যই এই জন্মে আবার ফিরে আসতে হয়েছে তোমায়। তোমার সেই অভীষ্ট পূরণের জন্যই এবার এই সহায়ক ক্রিয়াগুলি তোমায় দেখিয়ে দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন গুরুজী।"

কথা বলতে বলতেই লামার খাওয়া শেষ হয়ে যায়। তারপর দোকানের দাম মিটিয়ে দিয়ে আমি লামাকে নিয়ে নেমে আসি পথে। পথে নেমে লামা বলেন, "দেখ খোকাবাবু, কালীঘাট তো ব্যস্ত অঞ্চল। আশপাশ দিয়ে অগণিত লোকজন হাঁটাচলা করছে। এখানে গুপ্তক্রিয়া দেখানো ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিই। আমি এখন আজ্ঞাচক্রে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি — এরকম জায়গা বেশ কাছেই আছে। অদূরেই আদিগঙ্গার তীরে আলিপুর জেলের পিছনে যে ফাঁকা মাঠটি আছে সেটিই বর্তমানে এই গুপ্ত ক্রিয়া দেখানোর জন্য উপযুক্ত। তাই চল — আমরা এখন আদিগঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদিকেই এগোই। ওখানে গিয়েই তোমায় সেই গুপ্ত ক্রিয়াগুলি দেখিয়ে দেব।"

লামার কথামত আদিগঙ্গার তীর ধরেই কথা বলতে বলতে আমরা অগ্রসর হলাম। বেশীক্ষণ অবশ্য হাঁটতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মাঠে গিয়ে পৌছলাম আমরা। লামা সেখানেই আমায় নিয়ে বসলেন ; কিছুক্ষণ সময় নিয়ে দেখিয়ে দিলেন কয়েকটি গুপ্ত ক্রিয়া। এতদিন তো যোগ বা ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কম বই পড়িনি। কিন্তু এই ক্রিয়াগুলির উল্লেখ কোথাও কখনোই দেখিনি। ক্রিয়াগুলি সকল আধারের জন্যও নয় ; তাই সেই সম্বন্ধে কিছু বিবরণও এখানে লেখা গেল না।

লামা প্রতিটি ক্রিয়াই আমাকে খুব ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর বললেন — এগুলি শুধুমাত্র জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মারা ছাড়া বাইরের কেউই জানেন না ; তাঁদের সম্মতি ভিন্ন এই ক্রিয়াপ্রাপ্তি অসম্ভব।

সেদিন আমাকে ক্রিয়াগুলি দেখিয়ে দিয়েই লামা উঠে পড়েছিলেন। আমায় বলেছিলেন, "এবার আমি বিদায় নেব। এই ক্রিয়াগুলি দেখিয়ে দিতেই তোমার কাছে এসেছিলাম আমি। আমার সেই কাজ শেষ হয়েছে। তাই এখন আমায় ফিরতে হবে।"

কিন্তু সেই মুহুর্তে লামাকে যে ছাড়তে আমার মন চাইছিল না। তাই বললাম, "যাবেন তো বটেই। কিন্তু আর কিছুক্ষণ কি থাকা যায় না?"

লামা হাসলেন, "আসলে এই কর্মময় জগতে প্রতিটি মুহুর্তেই আমরা নিয়োজিত থাকি জগৎকল্যাণের কর্মযজ্ঞে। যেখানে আমাদের যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণই সেখানে থাকি। আর কাজ শেষ হলেই বেরিয়ে পড়ি পরবর্ত্তী কর্মক্ষেত্রের দিকে। তাই এখানেই বা নিয়মের ব্যতিক্রম হবে কেন?"

আমি বললাম, "আপনি সুদূর সাংগ্রীলা থেকে এসেছেন এতদূর শুধু আমাকে কৃপা করার জন্য। আর এমন অভাবিতভাবে আমাকে কৃপাও করলেন আপনি। তাই আমার প্রতি আপনার গুরুনির্দেশিত দায়িত্ব শেষ হলেও আপনার প্রতি যে এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করছি আমি। তাই আপনার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জাগছে আমার মনে। মন জানতে চাইছে আপনার সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলা ও সেখানে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে জানার লক্ষ্যে কি আপনার কৃপা পাব না?"

লামা হেসে বললেন, "দেখ খোকাবাবু, আমি তোমাকে কৃপা করিনি। কৃপা করেছেন গুরুজী। এখানে তোমার কাছে আমি এসেছি তাঁরই নির্দেশে। তিনি ঠিক যেটুকু বলেছেন সেটুকুই আমি দিয়েছি তোমায়। তাঁর আজ্ঞা ভিন্ন আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই তাঁর আদেশ না পেলে আমাদের সেই গুপ্ত সাধনক্ষেত্র ও সেখানে আমার সাধন-অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গেও কিছুই বলতে পারব না আমি। তবে যদি তিনি আদেশ করেন, অবশ্যই তোমাকে জানাব সেখানকার কথা।"

—"তবে কি আবার আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য হবে?"

—"যদি গুরুজীর আজ্ঞা হয় নিশ্চয়ই হবে। আর তিনি তো তোমায় স্নেহ করেন। তাই তোমার এই সৎ কামনাও তিনি পূরণ করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর আমার সেই বিশ্বাস বাস্তবায়িত হলেই আমি তোমাকে দিতে পারব এই প্রশ্নের উত্তর।"

—"কিন্তু কবে?"

—"যখন সময় হবে। আমাদের এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনাই যে পূর্বনির্দিষ্ট। যখন যা ঘটবার কথা আছে একমাত্র তখনই তা ঘটবে। আর সেই ঘটনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখাই আমাদের কর্তব্য। এখন তোমার কাজ — এই ক্রিয়াগুলি নিভৃতে অনুশীলন করে যাওয়া। সেজন্য যথাসাধ্য জনসংযোগ কমিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যে নিজে ডুব দাও। বাকি সব ছেড়ে দাও ইষ্টের উপর। জেনো — তোমার সব সৎ কামনাই তিনি পূর্ণ করে দেবেন যথাসময়ে।"

সেদিন এটুকু বলেই বিদায় নিয়েছিলেন এই লামা। সেই থেকে আমিও তাঁর কথামতই কাজ করে গিয়েছি আর বাকি সব সঁপে দিয়েছি ইষ্টের চরণে। নিজেকে এই ক্রিয়ার জন্য যথাসাধ্য গুটিয়েও নিয়েছি সকল জাগতিক ক্ষেত্র থেকে। ডুব দিয়েছি ক্রিয়ার মাঝে পরমানন্দে। আর নিজের গভীরে এভাবে ডুবে গিয়ে উপলব্ধি করেছি ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের ভিতরে অনন্ত অসীমের অপার কৃপা।

তবে ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের ভিতরে ডুবে গেলেও মনের মাঝে সাংগ্রীলার এই অনামা লামার স্মৃতিও জেগে ছিল আপন মহিমায়। প্রতীক্ষায় ছিলাম — আবার কোনদিন যদি তাঁর সাথে ফিরে দেখা হয়! বিধি সত্যিই করুণাময়। এতদিন বাদে এই লামা আংডেনের পাহাড়ী পথের নিরালা গুহায় তিনি আবার মিলিয়ে দিলেন সেই সাংগ্রীলার গুপ্তযোগীর দেখা।

লামার দেখা পেয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল স্মৃতির বান। বিস্ময়ে বুঝি বা মূক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই লামার প্রশ্নের উত্তর দিতে মিনিটখানেক বিলম্ব হয়ে গেল। অতএব লামা চোখ খুললেন। আর তারপর আবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, "কি খোকাবাবু, যা জিজ্ঞাসা করলাম তার উত্তর দিলে না? কেমন আছ? আর ক্রিয়াগুলো ঠিকমত করছ তো?"

লামার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তিতে আমার চমক ভাঙল। মৃদু হেসে বললাম, "ক্রিয়ার খবর এবং আমি যে কেমন আছি তা তো আপনার অজানা নয়। আর আপনাকে নিয়ে আমার মনে যে প্রশ্নগুলো সুদীর্ঘ দুই বছর ধরে শিকড় গেঁড়ে রয়েছে তাও আপনি জানেন। মনে আছে — আপনি গতবার আমাকে বলেছিলেন যে আপনার গুরুজীর কৃপা হলেই আমি আবার পাব আপনার দেখা আর তখনই আপনার সাধনজগৎ সম্বন্ধেও পাব আমার প্রশ্নের উত্তর। তাই এখন আপনার দেখা পেয়ে আমি যে একটু বেশীই ভাল আছি তা বলাই বাহুল্য।"

আমার উত্তরে লামা হো-হো করে হেসে উঠলেন। নির্জন গুহা গমগম করে উঠল তাঁর সেই হাসির শব্দে। তারপর তিনি বললেন, "সত্যিই, ভবি ভুলবার নয়। দু বছর আগে বিদায় নেয়ার আগে যে প্রশ্ন করেছিলে আজ ফিরে দেখার সাথে সাথে সেই প্রশ্নই স্মরণ করিয়ে দিলে। তোমার জানার আকাঙক্ষা সত্যিই অদম্য।" তারপর একটু থেমে বললেন, "তোমার আবেদন গুরুজীকে জানিয়েছিলাম আমি। আর সব শুনে তিনিও সানন্দে মত দিয়েছেন। তবে ফিরে দেখার জন্য যে আজকের রাতটিই নির্দিষ্ট ছিল। তাইতো তোমাকে প্রতীক্ষা করতে হল আজ অবধি। আজই মিলবে তোমার প্রশ্নের উত্তর। তোমাকে জানাব যোগীদের সেই গুপ্ত সাধনপীঠের বিবরণ এবং সেখানে আমার সাধনার অভিজ্ঞতার কথা। তবে তার আগে যে ক্রিয়াগুলি তোমাকে দিয়েছি তার একটু পরীক্ষা নিয়ে নিই। কেমন?"

আমি সানন্দে মাথা নাড়লাম। তারপর লামার নির্দেশমত তাঁর সামনে পদ্মাসনে বসে প্রস্তুত হলাম ক্রিয়ার পরীক্ষা দেয়ার জন্য।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘটল এক বিপত্তি — ঠিক সেই সময়েই লামার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা সাপটি ফণা তুলে চলতে শুরু করল। স্পষ্ট দেখলাম — ফণা তুলে এঁকেবেঁকে সেটি এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। এরকম একটি বড় সাপকে এঁকেবেঁকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পরীক্ষা দেয়ার আগেই আমার তো শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হল।

দুই

সাপটিকে এভাবে এঁকেবেঁকে আমার দিকে আসতে দেখে আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম ঠিকই। তবে সাপটি কিন্তু আমাকে আক্রমণ করার কোন প্রবণতা দেখাল না। ফণা তুলে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলেও করল না কিছুই। শুধু কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল আমার চোখের পানে। তারপর ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। সেদিকে চেয়ে মৃদু হেসে লামা বললেন, "ওকে ভয় কোর না। ওকেও আমারই মত সাধনপথের পথিক ভেবে

তোমার ক্রিয়া শুরু কর নিশ্চিন্তে।''

বাস্তবিকই নিশ্চিন্তে ক্রিয়ার পরীক্ষা দেয়ার পরিবেশই বটে। বাইরে বৃষ্টি চলছে পুরোদমে। ছোট্ট গুহার মধ্যে ধুনির সামনে লামা উপবিষ্ট। তাঁরই সামনে বসে আছি আমি। পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে বড় একটি সাপ। এমন অবস্থায় নিশ্চিন্তে ক্রিয়া দেখানো কি এতই সহজ!

তবু সেই কঠিন কাজটাই সহজভাবে করার চেষ্টা করলাম। দীর্ঘ দুই বছরের চেষ্টায় ক্রিয়াগুলি কিছুটা তো আয়ত্ত হয়েছে। যদিও পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপ শুয়ে থাকায় একটু আড়ষ্ট যে হয়ে যাচ্ছিলাম তা বলাই বাহুল্য, তবু ক্রিয়াগুলি করে দেখালাম। লামাও কড়া পরীক্ষকের মতই সব দেখলেন ; দুয়েকটি জায়গায় আমার শ্বাসক্রিয়া ও কুম্ভকে সামান্য ভুল হচ্ছিল। লামা সেগুলি আবার দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, ''আমার সাথে এই সর্পরাজকে দেখে এত আড়ষ্ট হয়ে পড়লে কেন?''

আমি বললাম, ''আসলে আপনাকে ক্রিয়া দেখানোর সময় বারবার যে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছিল যাতে সাপের গায়ে হাত না পড়ে যায়। পড়লে সাপ তো আর যৌগিক ক্রিয়ার মাহাত্ম্য বুঝবে না ; সটান দেবে যে দংশন। তাই একটু সাবধানে থাকতে হচ্ছিল বৈকি।''

লামা মৃদু হাসলেন, ''বুঝেছি। তবে কি জানো — এই সাপটি কিন্তু কোন সাধারণ সাপ নয়। গতজন্মে ছিল বড় যোগী। যোগপথে স্খলনের জন্য এই জন্মে ওর এই দশা। এজন্মে ও আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গী। সেবকও বলতে পারো। যখন আমি সাধনায় নিয়োজিত থাকি তখন ওর উপর থাকে প্রহরার দায়িত্ব। তবে কারো সাথে আমাকে কথা বলতে দেখলে ও বুঝে নেয় যে এ যোগী বা ভক্ত মানুষ। তখন আর ও কোন ঝামেলা করে না।''

আমিও হাসলাম, ''সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার।''

—''কিছুই অদ্ভুত নয়। আমরা যারা সাংগ্রীলায় যোগসাধনা করি তারা সকল প্রাণীদের ভাষাই বুঝি আর তাদের সাথে সংযোগও ঘটাতে পারি অক্লেশে। সমস্ত জীবজগতের সাথেই তাই আমরা সংযুক্ত থাকি সর্বদা।''

—''এই সাংগ্রীলা মঠ কোথায়?''

—''সাংগ্রীলা মঠের অবস্থান রয়েছে তিব্বতের এক প্রত্যন্তর প্রদেশের পার্বত্য

অঞ্চলে। তিব্বতের যোগীদের পরম পবিত্র সাধনক্ষেত্র এই গুপ্তমঠ সাংগ্রীলা।''

—''আপনি এই সাংগ্রীলার সাথে যুক্ত হলেন কিভাবে?''

—''সে এক লম্বা কাহিনী। দার্জিলিঙে যে আমার জন্ম তাতো আগেই বলেছি। আমার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রামবাহাদুর গুরুং। অল্পবয়সেই আমি বাবা-মাকে হারাই। বাবার মৃত্যু হয়েছিল আমার জন্মের দুই বছর পর। পিতৃহারা এই শিশুকে মাই বড় করে তুলছিলেন। এজন্য মা খুবই পরিশ্রম করতেন। আয় অবশ্য সেই অনুপাতে হত না। আসলে তিনি যে চা বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ করতেন। মাকে সম্বল করেই আমি বড় হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু আমার যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তখন কয়েকদিনের জ্বরে তিনিও আমাকে ছেড়ে চলে যান। ফলে বিশাল পৃথিবীতে আমি একলা হয়ে পড়ি। কি করব, কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সেইসময়েই আমার যোগের পথের গুরু রেচুং লামার সাথে যোগাযোগ হয়। আমাকে প্রথম দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার হল যোগের আধার। তিনিই আমাকে নিয়ে যান সাংগ্রীলায়। আর সেখানে রেচুং লামা আমাকে সাধনা করিয়ে দেখান যোগসিদ্ধির পথ। আর যোগসিদ্ধির পর বিজ্ঞানসাধনার জন্য তিনিই আমাকে প্রেরণ করেন জ্ঞানানন্দজীর কাছে। তিনি বর্তমানে পৃথিবীর সব তরুণ যোগীদের উন্নতিকল্পে কাজ করছেন। সেই কর্মযজ্ঞের সূত্রেই তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন তোমার কাছে।''

—''এতো গেল পুরো ঘটনার সারাংশ। কিন্তু আমি যে একটু বিস্তারিতভাবে শুনতে চাই। আমার সেই চাওয়া কি পাওয়ার রূপ নেবে না?''

—''এই হল লেখকদের নিয়ে সমস্যা। কোন ঘটনার ইঙ্গিত পেলেই হল। অমনি বিশদে শোনা চাই।'' ছদ্ম বিরক্তির সুরে কথাটা বলেই হেসে ফেলেন লামা। তারপর সহাস্যে বলেন, ''আচ্ছা ঠিক আছে। গুরুজী যখন অনুমতি দিয়েছেন তখন খুলেই বলি সব কথা। কে বলতে পারে — আমার সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী নিয়েও হয়তো খোকাবাবু আরেকটা বই লিখে ফেলবে!''

—''তেমন সাধ যে নেই তা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব না। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব — আপনি আমাকে খোকাবাবু বলেন কেন? বয়স তো আমার তেতাল্লিশ হয়ে গেছে।''

—''যথার্থ খোকাবাবুর মতই প্রশ্ন। তেতাল্লিশ আবার একটা বয়স নাকি?

আমি যে সাংগ্রীলায় সাধনা করি সেখানে দুই হাজার বছর বয়সের মহাত্মারাও সাধনা করেন। এমনকি আমাদের সাংগ্রীলার নিয়ন্ত্রণ যেখান থেকে হয় সেই জ্ঞানগঞ্জে তো চার যুগে অমর মহাত্মারাও সাধনা করেন বলে শুনেছি। আমি অবশ্য আজো সেখানে যাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু আমার বিজ্ঞানের পথের গুরুজী জ্ঞানানন্দজীর মুখে শুনেছি সেখানকার সাধনধারার কথা।"

—"জ্ঞানানন্দজীর মুখে আমিও শুনেছি জ্ঞানগঞ্জের কথা। কিন্তু সাংগ্রীলা সম্বন্ধে শুনিনি কিছুই। তাই আপনার কাছ থেকে সেখানকার অভিজ্ঞতার কথাই আজ জানতে চাইছি বিস্তারিতভাবে।"

আমার অনুরোধে লামা মৃদু হেসে বলতে শুরু করেন তাঁর সেই অপার্থিব অভিজ্ঞতার কথা।

"আসলে কি জানো — মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অবলম্বন হলেন মা। মায়ের জন্যই আমরা পৃথিবীর আলো দেখতে পাই। মায়ের সাহচর্য্য, স্নেহ ও ভালবাসার মধ্য দিয়েই আমরা বড় হয়ে উঠি। তাই মা থাকেন আমাদের সকল সত্ত্বা জুড়ে। সর্বতোভাবেই স্নেহ-মায়া-মমতায় আমাদের ভরিয়ে রাখেন মা প্রতিটি মুহুর্তে। তাইতো আমার মতে মা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। জাগতিক জীবনে প্রতিটি মুহুর্তে আমাদের হাত ধরে থাকার জন্য মায়ের রূপে ঈশ্বরই প্রকট থাকেন আমাদের কাছে।

তাই মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সেই মা যখন হারিয়ে গেলেন আমার জীবন থেকে, তখন এক অদ্ভুত শূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। চারপাশের নীল পাহাড় আমার চোখে হারিয়ে ফেলল সৌন্দর্য্য। পাহাড়ী ঝর্ণাগুলি আমার দৃষ্টিতে হারিয়ে ফেলল প্রাণোচ্ছ্বাস। আমার চোখের সামনে আশপাশের সবকিছুর রঙই ফিকে হয়ে উঠল। দার্জিলিঙে মায়ের সাথে যে পাহাড়ী বস্তিতে আমি থাকতাম সেটিও মায়ের অবর্তমানে কেমন বিরক্তিকর লাগতে লাগল। মা থাকাকালীন বস্তির সকলে আমাকে কত ভালবাসত। কিন্তু মা চলে যাওয়ার পর আমি হয়ে উঠলাম তাদের অবহেলার পাত্র। আমার প্রতি কিছুদিন আগেও যাদের ছিল অত স্নেহ সহসাই তারা আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সব মিলিয়ে আমার জীবন যেন বিষিয়ে উঠল মা হারানোর শূন্যতায়। বুকের কাছে একটা দলাপাকানো কান্না যেন পাথরের রূপ ধরে চেপে বসতে

লাগল। তাতে চোখে জল আসত না হয়তো ; কিন্তু আমার সমস্ত সত্ত্বা এক অব্যক্ত কান্না কেঁদে যেত নিঃসীম যন্ত্রণায়।

সেদিনও পাহাড়ের ধারে নিরালায় বসে ভাবছিলাম আমার ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা — মনে আসছিল এই ছোট্ট জীবনে মায়ের সাথে কাটানো সেই সুখের মুহূর্তগুলির কথা। যতই সেই স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম ততই তখনকার যন্ত্রণা আরো বেশী করে ঘিরে ধরছিল আমায়। পেয়ে হারানোর কষ্ট যে স্মৃতির রোমন্থনে আরো বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে।

ঠিক সেইসময় হঠাৎই কাঁধে একটি হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। ফিরে দেখি একজন যুবক লামা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আমাকে এভাবে দেখে নেপালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, তোর খুব কষ্ট, তাই না?'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম তাঁর দিকে। আগে তো কখনো দেখিনি এই লামাকে। পরণে গেরুয়া গাউন। সুন্দর, সুঠাম দেহ। মুণ্ডিতমস্তক, মুখচোখে দিব্যকান্তি। আর দুচোখের দৃষ্টি অপার মায়াভরা। তিনি সস্নেহে আমাকে বললেন, 'ওরে, এই জাগতিক পৃথিবী শুধুই কষ্টে ভরা, যন্ত্রণায় ঘেরা। এখানকার কোন কিছুই তোকে শান্তি দিতে পারবে না। শান্তি পেতে হলে বোধিসত্ত্ব হবার চেষ্টা কর্। মনে রাখিস — তুই মানুষ। এই মানুষ জন্ম হল শ্রেষ্ঠ জন্ম আর মানবশরীর হল শ্রেষ্ঠ আধার। অনেক জন্মের সাধনায় এই দেহ মেলে। সকল জীবদেহের মধ্যে একমাত্র এই আধারের পক্ষেই সাধনা করে নিজের মুক্তি অর্জন এবং অন্যদেরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। একমাত্র এই আধারের পক্ষেই সবরকম বাধা অতিক্রম করে ধ্যানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব। আর জাগতিক বিষ অতিক্রম করতে হলে চাই বিশ্বাস। আপন অন্তরাত্মার উপর বিশ্বাস রেখে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হয় ধ্যানের গভীরে। তাহলেই জাগতিক পৃথিবীর সকল জারিজুরি শেষ। তাই স্থূল পৃথিবীকে দুঃখ দেয়ার সুযোগ না দিয়ে ধ্যান ও যোগের পথ ধরে এগিয়ে চল্। নিজের মধ্যে ডুব দে। তবেই পাবি নির্বাণের শান্তি।'

লামার কথা আমার চোদ্দ বছরের মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু যে ঢুকল এমন নয়। তবে মনে হল — ইনি যেন আমার যন্ত্রণাময় জীবনে শান্তিদূত হয়ে এলেন। মা চলে যাওয়ার পর এমন সস্নেহে কেউ তো কথা বলেনি আমার সাথে। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে শান্তি পেতে হলে কি করতে হবে?'

—'আগে শান্ত হতে হবে। শান্ত না হলে যে শান্তি মেলে না। ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত হয়ে ধর্ম অনুশীলন করতে হবে গুরুসঙ্গের মাধ্যমে। প্রথমে হয়তো অনেক ভুল হবে। কিন্তু অনুশীলন তোকে নির্ভুল করে দেবে। তখনই মনে আসবে শুদ্ধচিন্তা। মনের অশুদ্ধি দূর হয়ে যাবে। সেইসময়েই তোর পক্ষে নিজেকে জানা সম্ভব হবে। আর তারপরই সাধনার মাধ্যমে তুই পৌঁছতে পারবি বোধিসত্ত্বের স্তরে। তখন তোর মন হয়ে উঠবে প্রশান্ত ও দেহেমনে বিরাজ করবে এক অপার আনন্দ। কিন্তু সেজন্য তোকে সাধনা করতে হবে। তোর ভিতরে যে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে তাকে সম্ভবে রূপায়িত করতে হবে। আর তার জন্য ডুব দিতে হবে নিজের ভিতরে।'

—'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?'

—'ধ্যানের মাধ্যমে। বাইরের জগৎ থেকে মনকে তুলে নিয়ে নিজের ভিতরের অনন্ত শক্তি ও অসীম শান্তির খোঁজ করতে হবে। তোকে তো বললাম — সব জন্মের মধ্যে সেরা জন্ম হল এই মানবজন্ম। তাই এই জন্মের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। তাই প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু করবি কিভাবে? এই জীবজগৎ জুড়ে তো শুধুই মায়ার খেলা চলছে। তাই তোকে প্রথমেই বুঝতে হবে — চারপাশে যা দেখছিস সবই শূন্যতায় পূর্ণ। কোনকিছুই সত্য নয় — সব মায়ার মরিচীকা। তাই রোগ শোক বা প্রিয়জন বিচ্ছেদের মত কোন পার্থিব চিন্তা নিয়ে ভেবে একটি মুহূর্তও ব্যয় করা উচিত নয়। তার পরিবর্তে আত্ম-চিন্তন এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা উচিত। আর সেজন্য সংসারের কোন পদার্থে বা সম্পর্কেই আসক্তি রাখতে নেই। যত আসক্তি ততই শক্তিনাশ ; যতই শক্তিনাশ ততই বিপর্য্যয়।'

—'কিন্তু সংসারের কারোর প্রতি আসক্তি থাকা কি পাপ?'

—'পাপ-পূণ্য বলে এ জগতে কিছু নেই। যা আত্মস্বরূপে পৌঁছনোর পক্ষে সহায়ক তাকেই আমরা পূণ্য বলি। আর যা সেই পরম লক্ষ্যে যাওয়ার পথ থেকে আমাদের পিছিয়ে দেয় তাকেই বলি পাপ। এই আসক্তির প্রতি আমরা কেন সাবধানতা অবলম্বন করে থাকি জানিস? কারণ আসক্তিযুক্ত মনের অনুকুল কিছু ঘটলে মন সুখ পায় আর প্রতিকুল কিছু পেলে মনে দুঃখ আসে। আর আমাদের সাধনার লক্ষ্য হল — সুখ আর দুঃখ দুইকেই অতিক্রম করে আপন স্বরূপে পৌঁছনো। তাই দেখতেই পাচ্ছিস — সাংসারিক আসক্তির লক্ষ্য সেই অবস্থায়

পৌঁছনোর জন্য প্রতিকুল।'

—'কিন্তু কেন?'

—'মরুভূমিতে গেলে অনেকসময়েই দূরে জল দেখা যায়। কিন্তু সত্যি-সত্যি তো জল থাকে না সেখানে। তাই বুদ্ধিমান মানুষ জলতৃষ্ণা পেলে সেদিকে ছোটে না ; কারণ সে বোঝে এটা মরিচীকা। একইভাবে সাংসারিক সম্পর্কের মাঝেও সুখ আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে সুখের ছদ্মবেশে দুঃখই লুকিয়ে থাকে সেখানে। তাই সুখ ভেবে দুঃখকে বরণ করার নামই আসক্তির সংসার।'

—'তাই কি?'

—'তাই নয় কি? এই যে তুই এমনভাবে মুখ শুকনো করে বসে কষ্ট পাচ্ছিস এর কারণ কি?'

—'কারণ — আমার মা মারা গেছেন। আমাকে এ জগতে একলা রেখে হারিয়ে গেছেন চিরতরে।'

—'জগতের নিয়মই হল — যে আসে তাকে ফিরেও যেতে হয়। এই পৃথিবীতে কেউই চিরজীবি নয়। মৃত্যুই হল জীবনের একমাত্র সত্য। তোর মা পৃথিবীতে এসেছিল। তার জন্য যে নির্দিষ্ট কর্ম ছিল তা করেছিল। তারপর যখন তার দেহত্যাগের সময় হয়েছে সে দেহ ছেড়ে চলে গেছে। এতো প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তুইও এর ব্যতিক্রম নোস। জন্ম যখন নিয়েছিস মরতে তোকেও হবেই। আর এই জন্ম ও মৃত্যুর মাঝের সময়টাই হল তোর জীবন। এর মধ্যেই তোকে যা করার করে নিতে হবে। তুই এই সময়ে তোর আত্মার উত্তরণ ঘটাবি না তাকে অধঃপতিত করবি সেটা তোকেই স্থির করতে হবে।'

—'আপাততঃ আমি শুধু এই যন্ত্রণার থেকে মুক্তি চাই।'

—'যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পেতে হলে তোকে প্রথমেই যন্ত্রণার উৎসে যেতে হবে। যন্ত্রণার উৎস কি? এই সংসার। সংসার শুধুই মায়াময়। তা শুধুই নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখায়। আর এই স্বার্থবোধ ঘিরেই সৃষ্টি হয় যত যন্ত্রণা। এই যে ধর্, মা হারানোর যন্ত্রণা তোকে ভোগাচ্ছে এর সিংহভাগই কিন্তু নিজের স্বার্থবোধ থেকে। তুই ভাবছিস — মা তোকে কত যত্ন-আত্তি করত, কত ভালবাসত। এখন মা নেই ; তাই তোরও সেই যত্ন আত্তি, ভালবাসা পাওয়ার উপায় নেই। সেটাই তোর কষ্টের মূল কারণ। কিন্তু তুই যদি নিজের স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিস এই বোধটাই

তোর মধ্যে আসবে না। সব অবস্থায় নিজেকে সমান রাখার একমাত্র উপায় — নিজের স্বার্থবোধ ত্যাগ। এজন্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বারবার মনকে জিজ্ঞাসা করবি, 'মন, তুই কি চাস?' আর দেখবি মন যেন উত্তর দেয়, 'আমি কিছুই চাই না।' এভাবে অভ্যাস করে ইচ্ছার বিনাশ করতে হয়। যখন মন থেকে ইচ্ছার বিনাশ হয় তখনই সুখ-দুঃখের উপর বিজয়লাভ হয়। আর তারপরই সুখ দুঃখ যাই আসুক তা বিধাতার বিধানরূপে গ্রহণ করতে পারবি।'

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তাঁর দিকে। তিনি বলে চলেন, 'মনে রাখবি — আত্মসাক্ষাৎকারের চেয়ে বড় লাভ নেই, সাধুসঙ্গের সমান কোন বন্ধু নেই, কুসঙ্গের মত কোন শত্রু নেই, দয়ার মত ধর্ম নেই, হিংসার মত পাপ নেই, ব্রহ্মচর্য্যের মত ব্রত নেই, ধ্যানের মত সাধনা নেই, শান্তির মত সুখ নেই এবং অজ্ঞানের মত অস্পৃশ্য কিছু নেই। আর এই সূত্রগুলি অনুভব করায় সাধনা। একমাত্র সাধনাতেই এই মহাজ্ঞান লাভ হয় এবং জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে।'

—'তাহলে আমিও সাধনা করব। কিন্তু সাধনার কিছুই যে আমি জানি না। আমাকে পথ বলে দিন।'

—'আমার তো তেমনটাই ইচ্ছা। তোর এমন সুন্দর আধার — ত্যাগের জন্য আদর্শ। তোর কথা আমি আমার গুরুজীকে জানাব। তাঁর কাছে অনুমতি চাইব তোকে যোগদীক্ষা দেবার জন্য। তিনি অনুমতি দিলে তোকে আমি নিয়ে যাব আমাদের সাধনক্ষেত্র সাংগ্রীলায়। দেখবি — সকল পার্থিব যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠে তুই পাবি এক পরম অপার্থিব জগতের সন্ধান। সাধনা তোর জীবনকে দেবে মহাজীবনের আস্বাদ।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, গুরুজীর অনুমতি হলে যাবি নাকি আমার সাথে সেই সাধনপীঠে?'

আমি মাথা নাড়লাম। আর অনুভব করলাম — সাধুর কথা শুনতে শুনতে আমার ভিতরের যন্ত্রণা যেন ফিকে হয়ে আসছে। যন্ত্রণার অশ্রুর ওপারে যেন দেখা দিচ্ছে রামধনুর আভাষ। এক অপার্থিব জগতের স্বপ্ন যেন ভেসে উঠছে আমার দুচোখের সামনে।'' বলতে বলতে লামার দু'চোখে জেগে উঠল এক অদ্ভুত উদাসী দৃষ্টি।

তিন

গুহার বাইরে এখনো চলছে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। শুরু হয়েছে তুষারপাত। শীত বাড়ছে ক্রমশঃ। শীতল বাতাসের দাপটও অব্যাহত। কিন্তু আমার সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। লামার স্মৃতিচারণের মাঝে যেন হারিয়ে গিয়েছি আমি।

তাই লামা থামতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপরই কি আপনি সেই লামার সাথে বেরিয়ে পড়লেন সাংগ্রীলার পথে?"

লামা মৃদু হেসে বললেন, "না। তারপরই নয়। আরো কিছুদিন পর। সেই লামা দার্জিলিঙে যে কাজে এসেছিলেন তা সেরে নেয়ার পর। তবে সেদিন থেকেই লামা আমাকে তাঁর সাথে রেখেছিলেন। আসলে মা চলে যাওয়ার পর আমার তো কোন স্থায়ী ঠিকানাই ছিল না ; জগৎমাঝারে ছিলাম একা। তাই হয়তো করুণাবশতঃ সেই লামাই দিয়েছিলেন আমায় আশ্রয়।

যে কয়দিন লামা দার্জিলিঙে ছিলেন সেই কয়দিন তাঁকে খুব কাছ থেকেই দেখেছিলাম। তাঁর নাম রেচুং লামা। সব ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ; যেকোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বন্যার মত বলে যেতেন। কোন কাজেই তাঁর অনীহা ছিল না। আর মনে রাখার মত ছিল তাঁর গুরুভক্তি। সকল কথাতেই তিনি গুরুকে স্মরণ করতেন। কখনো কখনো ঘরের দরজা বন্ধ করে ধ্যানে ডুবে গিয়ে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় তাঁর গুরুদেবের সাথে কথাও বলতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন যে আমার কথাও সেইসময়ে তাঁর গুরুদেবকে জানিয়েছেন। আর তাঁর গুরুদেবও তাঁকে সম্মতি দিয়েছেন আমাকে সাংগ্রীলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

এই কথা শুনে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম আমি। সেইসাথে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম এই চিন্তাতরঙ্গের ভাষা আমাকেও শিখিয়ে দেয়ার জন্য। শুনে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সাংগ্রীলায় প্রবেশের আগেই এই ভাষা তোকে শিখিয়ে দেব। সাংগ্রীলা তো শব্দের জগৎ নয় — নীরবতার জগৎ। ওখানে ভাব বিনিময়ের জন্য চিন্তাতরঙ্গের ভাষাই একমাত্র মাধ্যম।' রেচুং লামার কথা শুনে বৃদ্ধি পেয়েছিল আমার কৌতূহল। বুঝেছিলাম — এক নতুন স্বপ্নের দেশ অপেক্ষা করছে আমার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সেই নতুন স্বপ্নের দেশে যেতে কতদিন আপনার

লাগল?''

—''প্রায় একবছর। দার্জিলিঙ থেকে হিমালয়ের পার্বত্য পথ ধরে সিকিম হয়ে পায়ে হেঁটে তিব্বতে পৌঁছতেই তো এগারো মাস লেগে গিয়েছিল। তবে যাত্রাপথে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিলাম — পথে যখনই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করেছি তখনই নিজের থেকেই সাথের ঝোলাতে হাত ঢুকিয়ে রেচুং লামা আমার জন্য খাবার বের করে দিয়েছেন। তবে কখনো তাঁকে কিন্তু খেতে বা জল পান করতে দেখিনি। এমনকি দীর্ঘদিন কোন জায়গা থেকে খাবার সংগ্রহ না করা সত্ত্বেও কিভাবে যে তাঁর ঝোলা থেকে ওভাবে খাবার পেয়েছি তাও বুঝতে পারিনি। আসলে তখনো যে সেই মহান যোগীকে আমি চিনতেই পারিনি। তবে পরে বুঝেছিলাম — অসাধারণদের অসাধারণত্ব লুকিয়ে থাকে তাঁদের সাধারণ হাবভাবে ; তাঁরা নিজে থেকে কৃপা করে চিনতে না দিলে তাঁদের চেনা অসম্ভব।

রেচুং লামার সাথে সেই পথ চলা ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আর পথটিও ছিল এক অদ্ভুত পথ। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই — শুধু ধুসর পর্বতমালার মধ্য দিয়ে যাত্রা। ধুসর পর্বতমালার প্রান্তে চির তুষারের দেশ। সেই চির তুষারের দেশে প্রবেশের পথে লিপুলেখ অতিক্রম করার পরই চোখে পড়েছিল ওঁং পর্বত। ভোরবেলায় সূর্য্যের প্রথম রক্তিমাভার স্পর্শে পর্বতশীর্ষে তুষারপাতে সৃষ্টি হওয়া প্রকৃতির ওঁং দেখে ভরে উঠেছিল মন। অতঃপর তিব্বতে কৈলাস ও মানস সরোবরও দর্শন করেছিলাম। মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাস প্রদক্ষিণও করেছিলাম রেচুং লামার সাথে। তারপর রওনা হয়েছিলাম মানস সরোবরের উত্তরপানে।''

—''সেখানে তো শুনেছি — কোন জনজীবনের চিহ্ন নেই। আপনারা রাত কাটাতেন কোথায়?''

—''এইসব পথে বেশ কিছু গুপ্তমঠ আছে যা চতুর্থ আয়ামের অন্তর্গত। সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারে না। শুধু সেখানকার যোগীদের কৃপা হলে তবেই তাঁরা নিয়ে যান ভিতরে। রেচুং লামা তো সিদ্ধযোগী। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি এইসব গুপ্তমঠের কাছে এসে সেখানকার লামাদের সাথে সংযোগস্থাপন করতেন ধ্যানের মাধ্যমে। এইভাবে সেখানকার মহাত্মাদের থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই যেতেন ভিতরে। তাঁর সৌজন্যে আমিও সেসব গুপ্তমঠে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতাম। সাংগ্রীলা যাওয়ার পথে এরকম পাঁচটি গুপ্তমঠে রাত কাটিয়েছি আমি। তাছাড়া

এসব পথে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বেশ কিছু গুহা রয়েছে। সেরকম গুহাতেও রাত কাটাতাম। আর সেইসময়ে রেচুং লামা আমাকে যোগশাস্ত্রের পাঠ দিতেন। এর মধ্যে মূল শিক্ষা ছিল চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় ভাব বিনিময়। মুখে কথা না বলে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় কিভাবে কথা বলতে হয় তাই আমাকে শেখাতেন রেচুং লামা। আর সেজন্য মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই প্রথম ছয় মাস ধরে গভীর ধ্যানের মাধ্যমে আমার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনিয়েছিলেন তিনি। এভাবে মনের একাগ্রতা একটি বিশেষ স্তরে এসে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একটি ক্রিয়া শিখিয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে কোন একটি নির্জন স্থানে বসতেন রেচুং লামা। দুজনেই কোন একটি বিশেষ বস্তুর উপর মন দিয়ে ভাবতাম। আর তারপর মনে মনেই নিজের অনুভূতির কথা অপরকে বলতাম। সেইসময়ে মুখ কোন কথা বলত না ; মনে মনেই হয়ে যেত সব ভাব বিনিময়। আসলে সাংগ্রীলার মত গুপ্তমঠে লামারা যে এভাবেই নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করেন ; মুখে কথা বলে মঠের শান্তি বিঘ্নিত করেন না। তাই সাংগ্রীলা যাবার পথেই রেচুং লামা আমাকে নীরবতার ভাষায় কথা বলার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতি রাতে এভাবেই তিনি আমাকে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় মানসিকভাবে নির্দেশ দিতেন আর আমিও সেই নির্দেশ বুঝে নিয়ে নিজেকে চালনা করতাম। এভাবে প্রতি রাতেই চলত আমার সাধনা। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যেন কেটে যেত রাত। আসত নতুন দিন। বিশাল হিমাচ্ছাদিত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে শুরু হত যাত্রা। সেই যাত্রায় তুষারপাত ও কনকনে শৈত্যপ্রবাহ ছিল নিত্যসঙ্গী। মাঝে-মাঝেই পথে নামত তুষারধ্বস। সেইসব বাধার মধ্য দিয়েই রেচুং লামা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলতেন।"

—"আপনি তো তখন সবে চোদ্দ বছর পেরিয়ে পনেরো বছরে পা দেওয়া তরুণ। ওই তুষারপ্রদেশে এ হেন ভয়াবহ ঠাণ্ডায় কষ্ট হত না?"

—"না। কারণ তিব্বতে প্রবেশের আগেই রেচুং লামা আমাকে একটা সর্ষেদানার মত বীজ খাইয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে সাময়িকভাবে পথশ্রমের শ্রান্তি বা শীতের তাড়না আমাকে এতটুকুও বিচলিত করতে পারত না। তাই এই দুর্গম পথে সামান্য ক্লান্তিও আমাকে গ্রাস করতে পারেনি। দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল তুষারাচ্ছাদিত পথ ধরে হেঁটে গেছি দুজনে।

অবশেষে একদিন এক সুবিশাল পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে রেচুং লামা আমাকে

দেখালেন নীচের দিকে। বললেন, 'ওই মেঘের বলয়ের ওপারে যে উপত্যকা রয়েছে তার প্রান্তে রয়েছে আরেকটি রুক্ষ পাহাড়। ওই পাহাড়ের ওপারেই রয়েছে সাংগ্রীলা। আমাদের সাধনপীঠ।' আমি তো সেই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।" এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন লামা।

কিন্তু আমার যে আর তর সইছে না। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, "কি দেখলেন আপনি?"

—"পাহাড়চূড়া থেকে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম — দূরে ঘন মেঘে আচ্ছাদিত এক নিরালা উপত্যকা। উপত্যকার প্রান্তে ঘন মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করে কিছু উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়াও চোখে পড়ছে। এ যেন এক পটে আঁকা ছবি।

আমরা ধীরে ধীরে পর্বতশিখর থেকে নামতে লাগলাম সেদিকপানে। নীচের দিকে দেখা যাচ্ছে একটি শুকিয়ে যাওয়া জলের ধারা আর তার চারপাশে অসংখ্য বড় বড় বোল্ডার এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে। সেদিকপানে চোখ রেখে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। তখনই মনে হল — মাথাটা যেন সামান্য ঘুরছে। শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। আমার এই অসুবিধার কথাটা রেচুং লামাকে বললাম। লামা শুনে মৃদু হেসে বললেন, "ও কিছু নয়। আসলে আমরা তো বর্তমানে এক সম্পূর্ণ নতুন জগতে প্রবেশ করতে চলেছি। তাই শরীরে একটু অস্বস্তি তোর অনুভূত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

দেখতে দেখতে আমরা অনেকটা নেমে এলাম। এখান থেকে আশেপাশের সবকিছু অনেক পরিষ্কার দেখাচ্ছে। সেইমুহূর্তে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় যে দৃশ্য চোখ পড়ল তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। অদূরে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। মেঘের বলয় ভেদ করে জেগে থাকা উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়াগুলি সূর্য্যের বেলাশেষের রাঙা আলোয় রেঙে উঠেছে। কেমন যেন এক রাজসিক গাম্ভীর্য্য নিয়ে তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পর্বতশৃঙ্গের বুকে পড়ন্ত বিকেলের রঙের খেলা যেন ভরিয়ে দিল মন।

সামনের বরফাবৃত শৃঙ্গের পাদদেশের দিকে ইঙ্গিত করে রেচুং লামা বললেন, 'ওই যে দূরে মেঘে ঢাকা ক্ষেত্র দেখছিস ওখানেই রয়েছে সাংগ্রীলা। কিন্তু এখান থেকে তা তুই দেখতে পাবি না। কারণ বর্তমানে আমরা রয়েছি তৃতীয় আয়াম বা থার্ড ডাইমেনশনের জগতে। আর সাংগ্রীলা হল চতুর্থ আয়াম বা ফোর্থ ডাইমেনশনের

জগত। তাই যতক্ষণ না তুই সাংগ্রীলার মূল বসতিতে প্রবেশ করছিস ততক্ষণ ওই জগতের কিছুই তোর চোখে ধরা দেবে না।'

আমি হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু এই চতুর্থ আয়াম বা ফোর্থ ডাইমেনশন কি?'

—'ফোর্থ ডাইমেনশন বা চতুর্থ আয়াম হল ভুহীনতা এবং বায়ুশূন্যতার জগৎ। বিজ্ঞান বলে — বায়ুমণ্ডলে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বায়ুশূন্যতা থাকে। তেমনই পৃথিবীতেও অনেক এমন জায়গা আছে যেখানে বিরাজ করে ভূশূন্যতা। এরকম যে স্থানগুলি বায়ুশূন্যতা আর ভূশূন্যতার সাথে যুক্ত সেই জায়গাগুলিকেই বলা হয় চতুর্থ আয়াম বা ফোর্থ ডাইমেনশনের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র দেশ-কাল-পাত্রের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত থাকে। যখনই কেউ এই চতুর্থ আয়ামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই থ্রী ডাইমেনশনের জগতের প্রাণীদের চোখে সে অদৃশ্য হয়ে যায় যদিও তার অস্তিত্ব একইরকমভাবে প্রকট থাকে চতুর্থ আয়ামের ক্ষেত্রে। সেখানে কালের প্রভাব তেমন থাকে না বললেই চলে। এমনকি শারিরীক সক্ষমতা, দৈহিক ও মানসিক শক্তিও বিরাটভাবে বেড়ে যায়। ফলে বয়সের প্রভাবও পড়ে না দেহে।'

—'তাহলে বর্তমানে পনেরো বছর বয়সে আমি যে ওখানে প্রবেশ করব তারপর আমার আর বয়স বৃদ্ধি পাবে না?''

—'বৃদ্ধি পাবে। তবে খুব বিলম্বিত লয়ে। স্থূলজগতের দশ বছরে যতটা পরিবর্তন হয় তা ওখানে হয় একশো বছরে। অবশ্য এই চতুর্থ আয়ামের ক্ষেত্র ত্যাগ করে আবার এই তৃতীয় আয়ামের ক্ষেত্রে ফিরে এলে বয়স আবার জাগতিক পৃথিবীর নিয়মেই বাড়তে থাকবে।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'এই যে তোর সামনে আমাকে দেখছিস, তা আমার বয়স কত বলে মনে হয়?'

—'পঁচিশ?' আমি আন্দাজ করে বললাম।

—'তেমনই দেখতে আমায় লাগে বটে। তবে এই পঁচিশ ছিল আমার আশী বছর আগে। বর্তমানে আমার বয়স ১০৫। আসলে সাংগ্রীলায় বহু বছর তিব্বতীয় যোগের সাধনায় নির্বিকল্প অবস্থায় ছিলাম বলে আমার শরীরে কালের প্রভাব পড়েনি। যদিও আয়ু আমার বেড়েছে কিন্তু তার ছাপ পড়েনি দেহে। তাই এসব ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছর বেঁচে থাকা কোন ব্যাপারই নয়। অবশেষে যখন দেহ হাজার দুই বছর পর সাধনার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে তখন কায়াকল্প বা নতুন দেহ

সৃষ্টি করে তাতে প্রবেশ করলেই হল। তবে সাংগ্রীলায় কায়াকল্প হলেও নতুন দেহ সৃষ্টি করা হয় না। সেগুলি একমাত্র জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মারাই করতে পারেন।'

—'জ্ঞানগঞ্জও কি সাংগ্রীলার অন্তর্গত?'

—'না না। সাংগ্রীলা, কৌশিকী আশ্রম প্রভৃতি চতুর্থ আয়ামের যত যোগপীঠ আছে সবের নিয়ন্ত্রণ হয় জ্ঞানগঞ্জ থেকে। রাজ্য আর রাজধানীর মধ্যে যতটা পার্থক্য ততটাই পার্থক্য সাংগ্রীলা আর জ্ঞানগঞ্জের মধ্যে। জ্ঞানগঞ্জ থেকে বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয় সমস্ত বিশ্বজগৎ। আর সাংগ্রীলা, কৌশিকী আশ্রম প্রভৃতি যোগপীঠে হয় যোগ ও তন্ত্রের নিয়মিত চর্চা। এখান থেকে যোগসাধনা করে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরাই জ্ঞানগঞ্জের মহাত্মাদের অনুগ্রহ পান। তারপর মন চাইলে তাঁরা সেখানকার মহাত্মাদের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর বিজ্ঞানসাধনা করতে পারেন মহাসিদ্ধি ও অতিসিদ্ধি লাভের জন্য। এহেন জ্ঞানগঞ্জের আছে তিনটি স্তর। তার মধ্যে প্রথম স্তরে আছে বিজ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র। দ্বিতীয় স্তর হল জ্ঞানগঞ্জের গুপ্ত শক্তিপীঠ রাজরাজেশ্বরী মঠ যেখান থেকে জগতের কল্যাণের জন্য মহাত্মারা নিয়মিত যাগযজ্ঞ করেন ও তার মাধ্যমে স্থূল জগতের পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে থাকেন। আর তৃতীয়টি হল মহাতপার স্থান যেখানে ব্রহ্মের অব্যক্ত রূপে বিরাজ করে ব্রহ্মজ্যোতি। বাবাজী মহারাজ তথা তাঁর স্তরের মহাযোগীরা সেখানে জ্যোতিস্বরূপে বিরাজ করেন। আর তাঁদের সৌজন্যেই হয় পৃথিবী তথা অন্যান্য গ্রহের সকল মরলোকের নিয়ন্ত্রণ। ভেবে দ্যাখ্ — বর্তমানে আমাদের পৃথিবী তো পাপের ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে আছে; তাসত্ত্বেও পৃথিবীর ভারসাম্য এখনো বজায় আছে কিভাবে? এঁদেরই কৃপায়। এঁদের সাধনশক্তি এখনো পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই বলা যায় — জ্ঞানগঞ্জই পৃথিবীর মূল প্রাণকেন্দ্র। এই জ্ঞানগঞ্জ আর সাংগ্রীলা দুই-ই চতুর্থ আয়ামের অন্তর্গত হলেও মহাপবিত্র জ্ঞানগঞ্জ অনেক উচ্চস্তরের সাধনক্ষেত্র। যাহোক, আপাততঃ জ্ঞানগঞ্জের চিন্তা ছেড়ে সাংগ্রীলার দিকে মনোসংযোগ কর্।'

কথা বলতে বলতেই পাহাড় থেকে আমরা নামছিলাম উপত্যকায়। তখনই খেয়াল হল — অন্ধকার নেমেছে প্রকৃতির বুকে। গোধূলিবেলার শেষ আলো রাতের ঘন কালো মখমলের অন্তরালে মুখ লুকিয়েছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আশেপাশের প্রতিটি পর্বতচূড়াকে একের পর এক স্পর্শ করে চলেছে — যেন

কেউ একের পর এক স্বর্গীয় আকাশদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে আঁধারের প্রেক্ষাপটে।

অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা যখন উপত্যকায় এসে নামলাম তখন নির্জন নিস্তব্ধ উপত্যকায় শুধুই উথালপাথাল বাতাসের তীব্র শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছে না। দেখতে দেখতে একসময়ে আকাশের চাঁদও মেঘের ওড়নায় লুকোল মুখ ; শুধু টিমটিম আলো বুকে নিয়ে তারারা জেগে রইল আকাশের গায়ে।

তখনই খেয়াল করলাম — তিব্বতের এই উপত্যকা দিগন্ত বিস্তৃত ; কোথাও সমতল, আবার কোথাও বা উঁচু নীচু। দুপাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পর্বতমালা। অন্ধকার আকাশের প্রেক্ষাপটে এই ধুসর পর্বতমালা কেমন যেন বিমর্ষ, ম্রিয়মান — কিন্তু বরফাবৃত শিখরগুলি যেন এক অপার্থিব স্নিগ্ধ আলোয় ঝলমল করছে। রেচুং লামার সাথে হাঁটতে হাঁটতে আনমনে বিভোর হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম । হঠাৎই এক টুকরো সাদা মেঘ এসে বাঁদিকের বরফাবৃত পাহাড়চূড়াটি ঢেকে দিল। আর তারপরেই দূর থেকে বজ্রগর্জনের মত এক ভয়াবহ গুম-গুম শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আমি চমকে উঠে রেচুং লামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কিসের গর্জন?'

রেচুং লামা মৃদু হেসে বললেন, 'ওতো পর্বতে ধ্বস নামার শব্দ। এই উচ্চতায় ধ্বস, অ্যাভালাঞ্চ সবই তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওসব তো হয়েই থাকে। এতে চিন্তার কিছু নেই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাদের ঠিকানা আর কতদূর?'

রেচুং লামা বললেন, 'সামনেই আছে আমাদের বসতি — আমাদের মঠ সাংগ্রীলা। তিব্বতি ভাষায় 'লা' শব্দের অর্থ 'গিরিবর্ত্ম' বা 'পাস'। সাংগ্রী গিরিবর্ত্মে এই মঠের অবস্থান বলে এই মঠেরও নাম সাংগ্রীলা।'

ঠিক এইসময়ে চাঁদের আলোয় দেখলাম — আমরা এসে পড়েছি একটি রুক্ষ পাহাড়ের সামনে। এই রুক্ষ পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে গেছে পাকদণ্ডী পথ। সেই পথেই রেচুং লামার সাথে অগ্রসর হলাম আমি। খাড়া পাহাড়। তাই ধীরে ধীরে উঠতে হচ্ছিল। বুকে ক্রমশঃ হাঁফ ধরছিল। কিন্তু তাও আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম সামনের দিকে। এভাবে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় পর্বতের শীর্ষদেশে আমরা এসে পড়লাম। এখানে সামনের পথ আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঘন মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে পাহাড়চূড়াটি আবৃত করে রেখেছে।

অতঃকিম? চাইলাম রেচুং লামার দিকে। কিন্তু একি? তিনি তো দেখলাম হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়েছেন। সামনের দিকে চেয়ে কি যেন প্রার্থনা করছেন। অগত্যা আমিও একইভাবে বসলাম তাঁর পাশে। আর চেয়ে রইলাম সবিস্ময়ে রেচুং লামার দিকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে প্রার্থনা করার পর উঠে দাঁড়ালেন রেচুং লামা। আমার হাতটি ধরে বলে উঠলেন, 'ওঁং মণিপদ্মে হুম'। তৎক্ষণাৎ সামনের মেঘের বলয়ের' ওপার থেকে বহু কন্ঠে প্রতিধ্বনিত হল 'ওং মণিপদ্মে হুম।' এই প্রতিধ্বনি কানে আসতেই রেচুং লামার চোখমুখ ভরে উঠল আনন্দে। তৎক্ষণাৎ আমার হাত ধরে তিনি দৃপ্তপায়ে অগ্রসর হলেন ওই মেঘের কুণ্ডলীর দিকে।

দেখতে না দেখতে সেই মেঘের মায়া আমাদের ঢেকে ফেলল। কিছুক্ষণের জন্য আর কিছুই আমাদের চোখে পড়ল না। শুধু অনুভব করতে লাগলাম — আমার হাতের মুঠোয় ধরা আছে রেচুং লামার হাত। আর তাঁর হাত ধরেই এই মেঘের বলয়ের মধ্য দিয়ে উৎরাইপথে নেমে চলেছি আমি মনে একরাশ কৌতূহল নিয়ে।

চার

উৎরাইপথে নামতে নামতে সহসাই চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল মেঘের আবরণ। দেখলাম — আরেকটি অপূর্ব উপত্যকায় আমরা এসে পড়েছি। সামনে পাহাড়ের গায়ে বৌদ্ধ ঘরানার একটি মঠ দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার রাতে হাল্কা জ্যোৎস্নায় সামনের মঠটি বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে।

এবার মঠটির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম — তুষারমণ্ডিত পর্বতের কোলে প্যাগোডা আকৃতির বিরাট মঠ। মঠের গায়ে বড় বড় দণ্ডে টাঙানো আছে নানারঙের পতাকা। সেদিকে ইঙ্গিত করে রেচুং লামা বললেন, 'এই আমাদের গোম্ফা সাংগ্রীলা। বৌদ্ধমঠকে আমরা তিব্বতে গোম্ফাই বলে থাকি। প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো এই গোম্ফা।'

বাস্তবিকই দেখলাম – সাংগ্রীলা বিশাল মঠ ; বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। রেচুং লামা বললেন— মঠের চার দেওয়ালের মধ্যে অনেক ঘর ও সাধনস্থল আছে। প্রায় দেড়শো লামা এখানে তন্ত্র ও যোগসাধনায় মগ্ন থাকেন।

মঠের পিছনদিকে পাহাড়ের গায়ে বেশ কিছু বড় গুহাও চোখে পড়ল। সেই গুহার ভিতর থেকে এক অদ্ভুত জ্যোতির বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। রেচুং লামা জানালেন — প্রচ্ছন্নরূপে ওখানে মহাযোগীরা ডুবে থাকেন সাধনায়।

অতঃপর আমরা মঠের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সামনে সুবিশাল তোরণ। তোরণ পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম মঠের ভিতরে। প্রথমেই পড়ল বিশাল একটি খোলা প্রাঙ্গণ। তার চারদিকে পাথরের দালান বাড়ি আর ছোট ছোট সাধনকক্ষ। প্রাঙ্গণের মাঝে বেদীর উপরে বজ্রযোগিনী তারামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই তারামূর্ত্তি আমাদের ভারতে পূজিতা তারাদেবীর মত স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তি নয় — এই মূর্ত্তি রীতিমত ভয়ালদর্শনা। তাঁর গায়ের রং লাল। দেবীর এক মুখ, দুই হাত, তিন চোখ। ডান হাতে মাথার উপর তুলে ধরেছেন ছুরি। বাঁ হাত দিয়ে বুকের কাছে ধরে রেখেছেন একটি মড়ার খুলি। মাথায় পাঁচটি শুকনো খুলির মুকুট। গলায় পঞ্চাশটি ছিন্ন নরমুণ্ড। রেচুং লামা বললেন — এই মূর্ত্তির ভিতরে রাখা রয়েছে তিব্বতী ভাষায় মৃত্যুকে জয় করার মন্ত্র লেখা একটি পুঁথি। ওই পুঁথির মন্ত্রেই এখানে দেবীর প্রাণসঞ্চার করা হয়েছে ; আর তাই বজ্রযোগিনী তারাদেবী এখানে অমৃত প্রদায়িনী। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের সামনে এখানে পশুবলি হয়।

তারামূর্ত্তির ঠিক পাশ দিয়ে নেমে গেছে নীচে যাবার সিঁড়ি। সেখান দিয়ে খানিকটা নেমে আসতেই মাটির নীচে প্রশস্ত একটি হলঘরের সামনে এসে পড়লাম আমরা। ঘরের ভিতরে উপরভাগে কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হাল্কা নীলাভ আলো। কিন্তু কোন মশাল বা হ্যারিকেন জাতীয় কিছু চোখে পড়ল না। আমার মনে ছিল রেচুং লামার সাবধানবাণী — সাংগ্রীলায় মুখে কথা বলা বারণ। তাই চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই রেচুং লামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কিসের আলো জ্বলছে?'

রেচুং লামা মৃদু হেসে চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই বললেন, 'এখানে বাইরের তথাকথিত সভ্য জগতের সকল সামগ্রীরই প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই এখানকার আলোর ব্যবস্থাও হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। মঠের দেওয়ালগুলির উপরভাগে যেসব বড় বড় পাথর রয়েছে তাতে সবরকম ধাতুর উপাদান প্রকট করা আছে। মঠে সন্ধ্যাবেলায় যখন বড় ঘন্টাটি বাজানো হয় তখন ঘন্টার ধ্বনি ওই পাথরগুলোয় ধাক্কা খায় আর পাথরগুলির গায়ে যেসব ধাতুর উপাদান রয়েছে তাতে ধ্বনির তরঙ্গ এসে

লাগতেই ওর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়।'

এই বিরাট মঠের জীবনযাত্রা কিন্তু খুব শান্ত। কোথাও কোন কোলাহল নেই। আশেপাশে অনেক লামাকেই চলাফেরা করতে দেখলাম। কয়েকজন মহিলা লামাকেও দেখতে পেলাম সামনে। সবাই যে যাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু সবাই মৌন। এই মৌন জগতে শব্দের প্রবেশ নেই ; স্তব্ধতাই এখানকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

হলঘরের পাশ থেকে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরপানে। সেখান দিয়েই রেচুং লামা আমাকে নিয়ে চললেন তাঁর ঘরের দিকে। মঠের ভিতরের ঘরগুলি দেখলাম মূলতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী। অনেকগুলি এরকম ঘর পেরোনোর পর একটি কাঠের দরজার সামনে এসে থামলেন রেচুং লামা। তারপর দরজাটি খুলে একটি ছোট ঘরের ভিতরে আমাকে নিয়ে এলেন তিনি। ঘরের একপাশে তিব্বতী ভাষায় লেখা তন্ত্র আর যোগের উপর অনেক পুঁথি থাকে থাকে সাজানো আছে। তিব্বতী ভাষায় এসব পুঁথিতে যে কত মণিমুক্তা লুকোনো আছে তা পরে জেনেছিলাম। বিভিন্ন দেবদেবী, যক্ষ, কিন্নরদের বশ করার মন্ত্র, সিদ্ধিলাভের মন্ত্র, যোগপথে সিদ্ধির প্রণালীসহ সাধনপথের অসংখ্য মূল্যবান তথ্য লেখা রয়েছে এসব পুঁথিতে। তাই এসব পুঁথি সাংগ্রীলায় দেবতার মতই পবিত্ররূপে দেখা হয়।

এখানে দেওয়ালে রয়েছে পরমগুরু বজ্রধারার তৈলচিত্র। তার নীচেই ইয়াকের লোমের আসন। সেখানে বসে রেচুং লামা আমাকেও বসতে ইঙ্গিত করলেন সামনে। রেচুং লামার আসনের সামনে একটি কাঠের পিঁড়ি পাতা রয়েছে। তাতেই বসলাম আমি। তারপর রেচুং লামা বললেন, "এটিই আমার সাধনকক্ষ। এখানেই সাধনা করি আমি। এইটুকু ছোট খুপরী ঘর দেখে হয়তো বিস্মিত হচ্ছিস। কিন্তু নিজেদের বুদ্ধত্বের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায় কৃচ্ছ্রসাধন একান্ত আবশ্যক। এই সাধনায় নিজের স্থূল অহং সত্তাকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই অহং সত্তার সাথেই যুক্ত থাকে হতাশা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি সব অসুখের ভাব। আর এইসব অসুখের মূল আধার হল জাগতিক সুখের স্পৃহা। তাই সাধনপথে এগোতে হলে কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ, লোভ, বিতৃষ্ণা থাকা চলে না ; এমনকি সাধারণ অজ্ঞানী মানুষের মত কোন বিষয়ে হতাশা, উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাও রাখা চলে না। অর্থাৎ অহংসত্তা দমনের লক্ষ্যে আমাদের প্রথমেই ত্যাগ করতে হয় জগতের সকল আকর্ষণ। আর এই আসক্তি ত্যাগ করলেই আমাদের সাধনপথে

যাত্রা শুরু হয়।

তারপরে শুরু হয় আমাদের ভিতরের স্থূল অহংসত্ত্বার সাথে সংগ্রাম। অর্থাৎ সাধককে এই 'আমি'র সাথে সাধনসমরে নামতে হয়। অহংভাব মনে থাকলেই মায়ার জালে ধরা পড়তে হয়। আর মায়ার থেকে আত্মরক্ষা না হলে সাধনই ব্যর্থ। তবে সমস্যা হল — অহং-এর থেকে দূরে যাবারও তো উপায় নেই। কারণ সাধক যেখানেই যান না কেন, এই 'আমিত্ব' তাঁকে অনুসরণ করবেই। তাই আমরা এই অহংসত্ত্বার থেকে দূরে না পালিয়ে নিজেকে পরব্রহ্মের অংশ জেনে এর মধ্যেই ঝাঁপ দিই। আর যতই জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে এই আমিত্বের মধ্যে ডুব দিই ততই উপলব্ধি জাগে — এই স্থূল অহং-এর কোন অস্তিত্বই নেই। এ শুধুই মায়ার মরিচীকা। তখনই আমাদের উপর থেকে মায়ার পর্দা সরে যায় আর জাগতিক পৃথিবীর সকল আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় আমাদের পক্ষে। ফলে নৈতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে জেগে ওঠে শান্তি। একমাত্র তখনই যথাযথভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় সাধনপথে। সেজন্যই আমরা লামারা অসীম শক্তিধর হওয়াসত্ত্বেও এরকম দীনহীনভাবেই থাকি। তোকেও এরকমই হতে হবে। একজন সাধককে হতে হয় পাখীর মত মুক্ত। জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করতে হয় ; বিলাসিতা ও অলস জীবনযাত্রা যে মনকে কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে দেয়। তাই জীবনে সার্থক হওয়ার জন্য ত্যাগ এত প্রয়োজন।'

—'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিও এরকমভাবেই নিজেকে গড়ে তুলব।'

— 'অবশ্যই তুলবি। ত্যাগ, স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা মনকে পরিষ্কার রাখে এবং নির্জনতা উপলব্ধিতে সাহায্য করে। মন পরিষ্কার হলে এবং স্তব্ধতার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলেই তো তোর মধ্যে জাগবে ভিতরের শক্তি। আর সাধনপথে সেটাই প্রয়োজন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তবে এই যে ছোট্ট খুপরী ঘরটি দেখছিস এখানকার আধ্যাত্মিক অনুরণনও কিন্তু কম নয়। এখান থেকেই আমি সংযোগ রাখি বাইরের পৃথিবীর সাথে।''

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কিভাবে রাখেন সংযোগ? চিন্তাতরঙ্গের মাধ্যমে কি?'

রেচুং লামা হাসলেন, 'ঠিকই ধরেছিস। বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগের জন্য আমাদের কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। ধ্যানে বসেই আমরা বুঝতে পারি পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে! সেইমত যোগাযোগও করতে পারি সর্বত্র।'

আমি বললাম, 'তবে যোগাযোগ করতে পারলেও এখান থেকে যাওয়া আসা করা তো সহজ নয়। লোকালয় থেকে কত দূরে এই অঞ্চল!'

রেচুং লামা হাসলেন, 'দূরত্বটা তোর পক্ষে বেশী লাগার কারণ আছে। তোর দেহ তো আমাদের মত যোগসিদ্ধ বা তন্ত্রসিদ্ধ নয়। তাই পায়ে হেঁটেই এখানে আসতে হয়েছে তোকে। আর যেহেতু পথে নানা কাজ সারতে সারতে তোকে নিয়ে এসেছি আমি তাই এতদূর হাঁটতে হয়েছে আমাকেও। কিন্তু এখানে আমরা যখন নিজেরা একলা যাতায়াত করি তখন নিজের মূল স্থূলদেহটি মঠে রেখে সূক্ষ্মদেহ নিয়ে আকাশপথে চলে যাই নির্দিষ্ট স্থানে। সেখানে গিয়ে বাতাস থেকেই সব উপাদান সংগ্রহ করে কিছুদিনের জন্য আমরা মূল দেহের মত অবিকল একটি দেহ গড়ে নিয়ে সেটি ধারণ করে নিই। আবার কাজ শেষ করে সেই দেহ বাতাসে মিলিয়ে দিয়ে ফিরে আসি এখানে।'

আমি তো অবাক, 'এমনটাও কি সম্ভব?'

রেচুং লামা হাসলেন, 'আমাদের এখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। যোগ ও তন্ত্রের মাধ্যমে কি যে হয় তা তুই এখন ধারণাও করতে পারবি না। তবে তোকে তো এখানে নিয়ে এসেছি যোগের পথে গড়ে তোলার জন্য। তাই সময়ের সাথে সাথে তুইও ঠিকই উপলব্ধি করবি এখানকার সাধন-মাহাত্ম্য।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'তবে তুই এখন ক্লান্ত। তাই তোর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। আমার পাশের ঘরে তোর থাকার জায়গা করে দিয়েছি। সেখানে গিয়ে বিশ্রাম কর্। সকাল হলে আবার চলে আসিস এখানে। তখন তোকে নিয়ে যাব আমার গুরুজীর কাছে। তাঁর সাথে ভাব বিনিময় করেই ঠিক করব তোর যোগদীক্ষার দিন।' তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্ষিদে পেয়েছে?'

আমি একটু সলজ্জ হাসি হাসলাম। সারাদিনে কিছুই তো খাওয়া হয়নি। ক্ষিদের আর দোষ কি? তৎক্ষণাৎ রেচুং লামা আমার ডানদিকে নির্দেশ করে বললেন, 'তোর ডানদিকের রেকাবীতে কিছু খাবার আছে। খেয়ে নে।'

আমি তো হতবাক। আসলে পিঁড়িতে বসার সময়ে তো ডানদিকে কোন রেকাবী চোখে পড়েনি। কিন্তু এবার রেচুং লামার কথা শুনে সেদিকে চাইতেই দেখলাম — সত্যিই রয়েছে একটি রেকাবী। রেকাবীটি হাতে নিয়ে দেখলাম — তাতে গরম গরম জোয়ারের রুটি রয়েছে চারটি। সাথে মাখন আর ছাতু। সেটি

হাতে নিয়ে রেচুং লামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত গরম গরম খাবার কিভাবে এল এখানে?'

লামা হাসলেন, 'কিভাবে এল সেটা বড় কথা নয়। এসেছে এটাই বড় কথা। খেয়ে নে।'

অতএব সানন্দে সেই খাবার হাতে নিলাম। তবে প্রথম গ্রাসটি তোলার আগে ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি খাবেন না?'

রেচুং লামা হাসলেন, 'আমাকে খেতে হয় না। বাতাসই আমার খাদ্য। তাতেই আমার তথা এখানকার সকলের আহার হয়ে যায়। তবে এখন আর ভাব বিনিময় নয়। খেয়েদেয়ে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্।'

খেতে খেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই ঘরে কি আমি একলাই থাকব?'

—'অবশ্যই। কেন একলা থাকতে ভয় করে নাকি?'

উত্তরে মাথা নাড়লাম আমি। এবার রেচুং লামার মুখে ফুটে উঠল হাসি। চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই তিনি বললেন, 'ওরে, একাকিত্বই এই জগতের আসল সত্য। আমরা সকলেই এই জগতে এসেছি একা। যাবও একা। মাঝে এই জীবনধারণের সময়টুকু কেবল অন্যদের সাহচর্য্য আমরা পাই। তাই এই সময়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে আমরা পার্থিব বিষয়ে ভুলে থাকি। কিন্তু মৃত্যুর পর আমরা যে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে গিয়ে পড়ি সেখানে আমাদের চারপাশে সবাই থাকে অচেনা। সেখানে সবাই একলা। সেই অবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে থাক্। মনে রাখবি — মৃত্যুর মুহূর্তে বা তারপরে আমাদের সাথে এই জগতের কিছুই থাকবে না — কেউই থাকবে না। স্থূলজগতের যা কিছুর সাথে আমরা যুক্ত সবই এখানে পড়ে থাকবে। তাই আসক্তি এবং অপরের সান্নিধ্যের থেকে দূরে থেকে নিজের মধ্যে ডুব দেয়াটাই বোধিসত্ত্ব সাধনার প্রথম ধাপ। আর এজন্য একাকিত্বের অভ্যাসই হল আমাদের সাধনার প্রথম সোপান। অতএব খাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্তে গিয়ে শুয়ে পড়্ তোর নির্দিষ্ট ঘরে। কাল আবার কথা হবে।'

কথা শুনতে শুনতেই শেষ হয়ে গেল আমার নৈশভোজ। অতএব আমি মাথা ঝুঁকিয়ে রেচুং লামাকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। তাঁর সাধনকক্ষের পাশেই রয়েছে আরেকটি ছোট্ট ঘর। এই ঘরটিও কাঠ দিয়েই তৈরী। এখানেই আমার থাকার জায়গা হয়েছে। মেঝের উপর বিছানো আছে একটা সাদা চাদর। বালিশের

কোন ব্যবস্থা নেই। তবু এই প্রত্যন্তর মঠে এসে যা সুবিধা পেয়েছি তাই যথেষ্ট। অতএব সানন্দে এখানেই শুয়ে পড়লাম।

সাংগ্রীলা মঠে এক অপার্থিব শান্তি বিরাজ করছে। দার্জিলিঙের যান্ত্রিক কোলাহল তো দূরস্থান ; কোথাও এতটুকু শব্দও নেই। নীরবতার আনন্দে পরিপূর্ণ পরিবেশ। যেহেতু এই ঘরটি মাটির অনেক নীচে রয়েছে তাই বাইরের প্রকৃতির কোন চিহ্নও চোখে পড়ার উপায় নেই। ঘরের উপরপ্রান্তের আলোগুলিও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। দেখতে দেখতে কখন যেন বুজে এল চোখ। হারিয়ে গেলাম আমি ঘুমের জগতে।

যথাসময়ে ভোর হল তিব্বতের এই নিভৃত প্রদেশে। আমিও উঠে পড়লাম। মঠের একপাশে প্রাত্যহিক কৃত্য সেরে ঠিক সময়েই আমি চলে এলাম রেচুং লামার ঘরে। তিনি প্রস্তুতই ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, "চল্। গুরুজীর কাছে যাওয়া যাক। গুরুজী দীর্ঘদিন এখানকার 'গুরু শেনরাব' (প্রধান লামা) ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমাকে এই মঠের দায়িত্ব দিয়ে সাধনায় লীন আছেন। তবু আমি সকল কাজই তাঁর আজ্ঞা নিয়েই করি। আর সেজন্যই সবার আগে তোর দীক্ষার দিন স্থির করার বিষয়ে তাঁর আজ্ঞা নেয়া প্রয়োজন।'

রেচুং লামার গুরুজী মঠে থাকেন না। তিনি শুনলাম সাধনরত আছেন মঠের পিছনদিকে পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত গুহায়। অতএব আমরা সেদিকেই অগ্রসর হলাম। নির্জন নিরিবিলি ভোরে বাতাসের দাপট প্রচণ্ড। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু দূর থেকেই কানে আসে অ্যাভালাঞ্চের শব্দ। অ্যাভালাঞ্চ দেখে প্রথম প্রথম বেশ ভয় পেতাম আমি। তবে সময়ের সাথে সাথে তাতে অভ্যস্থও হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ অ্যাভালাঞ্চ, পাথর গড়ানো আর ধ্বস নামা তো এদিককার পাহাড়ের নিত্যনৈমিত্তিক বৈশিষ্ট্য।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সাংগ্রীলা মঠের পিছনদিকে চলে এলাম। এখান থেকে পর্বতের গা বেয়ে সামান্য একটু চড়াই রয়েছে। বড় বড় বোল্ডার পরপর ফেলা রয়েছে। সেই ইতস্ততঃ ছড়ানো বোল্ডারের উপর দিয়ে সাবধানে হাঁটতে হল কিছুটা পথ। এভাবে কিছুটা ওঠার পর যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে জুড়িয়ে গেল দুচোখ। সামনে একটি বিরাট জলপ্রপাত। প্রশস্ত নীলজলের ধারা সামনের পাহাড়ের চূড়া থেকে ভীষণ বেগে এসে পড়ছে নীচে আর সেখান থেকে তিন-চারটি ফেনিল

ধারায় বিভক্ত হয়ে আরো কিছুটা যাওয়ার পর একটি নদীর আকার নিয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। প্রপাতের নীচ থেকে সঙ্গম পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ঘন কুয়াশার আবরণ। তবে এই কুয়াশা ঘন হলেও কিছুটা যেন স্বচ্ছ মনে হল — কারণ তার ভিতর দিয়েই বিক্ষিপ্ত জলধারার তীব্র গতি চোখে পড়ছে। সঙ্গমের মুখে সেইসব বিক্ষিপ্ত ধারা এক হয়ে প্রবলগতিতে পর্বত কাঁপিয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে নীচের দিকে। প্রপাতটির জল এবং নদীর জল দুই-ই একদম টলটলে স্বচ্ছ। জলপ্রপাতের সেই অদ্ভুত ছন্দময় সৌন্দর্য্য মুহূর্তের মধ্যে ভরিয়ে তুলল মনপ্রাণ।

জলপ্রপাতটিকে ডানদিকে রেখে বেশ কিছুটা উঠতে হল উপরপানে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চড়াই ভাঙার পর আমরা দুজন এসে পড়লাম একটি গুহাপথের সামনে। সেই গুহার দিকে নির্দেশ করে রেচুং লামা বললেন, 'এই ওড়িয়ারের (গুহার স্থানীয় নাম) ভিতরেই সাংগ্রীলার সুপ্রাচীন যোগীরা সাধনমগ্ন থাকেন। এঁরা এখানে মহাসমাধীতে লীন থাকেন। এই গুহায় স্তব্ধতাই মূল বৈশিষ্ট্য। সময় এখানে থমকে থাকে। যোগীদের এই মহাসাধনক্ষেত্রে শব্দের সাথে সাথে সময়েরও প্রবেশ নিষেধ।'

অতঃপর রেচুং লামার সাথে প্রবেশ করলাম ভিতরে। গুহার ভিতরে প্রবেশ করতেই নাকে এল এক অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ। কিসের থেকে যে সেই গন্ধের উদ্ভব তা বুঝলাম না ; কিন্তু তার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মাদকতা অনুভব করলাম। সেই মাদকতা মনকে যেন আপনা থেকেই ভরিয়ে দিল এক অদ্ভুত আনন্দে।

গুহাটির আরেকটি বিশেষত্ব হল — ভিতরে কিন্তু একদমই অন্ধকার নেই। এক অদ্ভুত জ্যোতি ভেসে আসছে ভিতর থেকে। আর গুহাটির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য রন্ধ্রপথ। অচেনা মানুষের পক্ষে যথার্থ রন্ধ্রপথ চিনে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছনো দুষ্কর। তাই এমন ক্ষেত্রে পথ হারানোর ভয় তো হতেই পারে। তবে রেচুং লামা তো দীর্ঘদিন এখানে আছেন। তাই তিনি সাথে থাকার জন্য পথ হারানোর ভয় আমার জাগেনি।

লম্বা এই রন্ধ্রপথ ধরে যেতে যেতে গুহার ভিতরেই একটি প্রশস্ত ক্ষেত্রে আমরা এই পড়লাম। এখানে দেখলাম — পরপর পাথরের বেদী সার দিয়ে রাখা আছে আর তার উপরে ধ্যানমুদ্রায় বসে আছেন অনেক সাধক-সাধিকা। প্রত্যেকের দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন ; কোথাও এতটুকু কাপড়ের বালাই নেই। দুচোখ বন্ধ। দেহ অসাড়।

সামান্যতম নিঃশ্বাসও পড়ছে না কারো। ঠিক যেন সব পাথরের বিগ্রহ।

আমি অবাক হয়ে সেদিকপানে চেয়ে রইলাম। এ কি অদ্ভুত দৃশ্য! আমার দুচোখে বিস্ময় দেখে রেচুং লামা আবার চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় বললেন, 'এ হল সাংগ্রীলার গুপ্তযোগীদের সাধনস্থল। চারপাশে যাঁদের দেখছিস এঁরা সবাই উচ্চকোটির মহাযোগী — সমাধিতে রয়েছেন শতাধিক বছরের উপর। কারোর দেহেই প্রাণের লক্ষণ পাবি না। কিন্তু এঁরা মৃতও নন। প্রত্যেকেরই দেহ তেজদীপ্ত। এঁরা সবাই এখানে সমাধিতে আছেন।'

আমিও চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই নীরবে প্রশ্ন করলাম, 'তবে এঁরা এত বছর ধরে এখানে সমাধিতে আছেন কেন?'

— 'এঁরা প্রত্যেকেই মহাসিদ্ধযোগী। সাধনজগতের উচ্চস্তরে বিরাজ করছেন। যোগ ও তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে জয় করেছেন প্রকৃতিকে ; কালচক্রের উপরে উঠে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন। কিন্তু জগৎকল্যাণের জন্য কাজ যে করতে হয় অনেকভাবে। সেজন্য মূল শরীরটিকে সমাধিতে রেখে সূক্ষ্মে এঁরা জগৎকল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকেন। অনেকে আবার মূল দেহটি এখানে সমাধিস্থ অবস্থায় রেখে নতুন দেহধারণ করে স্থূল পৃথিবীতে যান মানুষকে পথ দেখাতে ; আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই কাজ সেরে মরদেহ ত্যাগ করে ফিরে আসেন মূল দেহে। কেউ আবার সমাধিতে থেকেই ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে জগতের ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণে রত থাকেন।'

— 'যাঁরা এখানে মূল দেহ রেখে পৃথিবীতে যান তাঁরা কি উপায়ে নতুন দেহ ধারণ করেন?'

— 'নানারকম প্রক্রিয়া আছে। কেউ মূল দেহ সমাধিতে রেখে আত্মাকে সাধনবলে বের করে নিয়ে মরলোকে গিয়ে নতুন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে দেহধারণ করেন পৃথিবীকে আলোর পথ দেখাতে। কেউ মূল দেহ সমাধিতে রেখে কায়াকল্পের মাধ্যমে অন্যের সদ্যমৃত দেহে প্রবেশ করে মরলোকের কর্মপ্রবাহে অংশ নেন। কেউবা মূল দেহ সমাধিতে রেখে সূর্য্যের আলো ও প্রকৃতির বিভিন্ন তত্ত্বের উপাদানের মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন দেহ সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে জগৎকল্যাণের কাজে রত থাকেন। পৃথিবীতে যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে আধ্যাত্মিক আলোর পরশ ছড়াতে যান তাঁরা অনেকেই এরকম গুপ্তমঠের সাথে যুক্ত থাকেন।'

— 'কিন্তু নতুন দেহ ধারণ করার পর এই মূল দেহ ধরে রাখার কি প্রয়োজন?'

—'এই দেহ যে সিদ্ধদেহ। সাধনার মাধ্যমে বিশেষ যৌগিক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ এই দেহ যে অমরত্বের আস্বাদ করেছে। তাই এই মূল দেহের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। স্থূল জগতের স্থূল পরিবেশে এই দেহকে নিয়ে গেলে ওখানকার কামনা-বাসনা-লোভ-লালসায় পূর্ণ আবহাওয়ায় এই দেহের কষ্ট হয়। তাই সিদ্ধযোগীরা মূল স্থূল দেহকে এরকম গুপ্তমঠে সমাধিস্থ রেখে অন্য দেহ ধারণ করে মরলোকে যান জীবকল্যাণের জন্য।'

—'তার মানে — যুগে যুগে যে মহাত্মারা পৃথিবীতে আলোর পথ দেখিয়েছেন সবারই মূল স্থূলদেহ এভাবেই কোন না কোন গুপ্তমঠে সমাধিস্থ অবস্থায় আছে?'

—'সবার নয়। তবে অনেকেরই আছে।' তারপর একটু মৃদু হেসে একটি কোণের দিকে ইঙ্গিত করলেন রেচুং লামা, 'দ্যাখ্ তো, ওনাকে চিনতে পারিস কিনা?'

আমি সাগ্রহে সেদিকে চাইলাম। আর সেদিকে চাওয়ামাত্র অবাক হয়ে গেলাম। ওখানে যিনি সমাধিস্থ আছেন তাঁকে তো ভারতবর্ষে একডাকে সকলে চেনে। ভারতবর্ষের এই সুমহান সন্তান যে সবারই বিশেষ প্রিয়। সেই বিরলকেশ, গোল মুখ, তেজদীপ্ত ভাব। শুধু দেহ নিস্পন্দ। মুখমণ্ডল জুড়ে এক অপার্থিব শান্তি। আমি চমকে উঠে বলতে গেলাম, 'ইনি তো...।'

কিন্তু বলতে পারলাম না। তার আগেই রেচুং লামা বলে উঠলেন, 'তুই যে ওঁকে চিনতে পেরেছিস তা আমি বুঝেছি। বর্তমানে উনি আচার্য্য নামেই এখানে পরিচিত। বছর কুড়ি ধরে ওনার স্থূলদেহ এখানেই সমাধিস্থ আছে।'

—'বছর কুড়ি? কিন্তু আমরা তো জানি — ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগেই ওনার মৃত্যু হয়েছে।'

—'ভুল জানিস। কারণ জেনে বুঝেই তোদের এই ভুল জানানো হয়েছে। উনি তারপরেও দীর্ঘকাল রাশিয়া ও চীনের স্থূল জগতে ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে চীন থেকে উনি তিব্বতে আসেন। তিব্বতের গহন কন্দরে ঘটনাচক্রে উনি জ্ঞানগঞ্জের এক মহাত্মার সান্নিধ্যলাভ করেন। তিনিই আচার্য্যকে এখানে নিয়ে আসেন এবং তিব্বতীয় গুপ্ত যোগে দীক্ষা দেন। সাধনজগতের বীজ ছেলেবেলা থেকেই ওঁর মধ্যে ছিল। তাই এখানে গুরুর দেখা পাওয়ার পর সেই বীজ দ্রুত মহীরূহ হয়ে

ওঠে। আসলে আচার্য্যের তো যোগের আধার। তাই স্বল্প সময়েই সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু এই সাধক যে দেশ-অন্তপ্রাণ। তাই মূল দেহ এখানে সমাধিস্থ রেখে কায়াকল্পের মাধ্যমে নতুন দেহ ধারণ করে উনি বর্তমানে ভারতের উন্নতিকল্পেই কাজ করছেন।'

—'তাহলে উনি কি আবার দেশে ফিরে এসে দেশের হাল ধরবেন?'

—'দ্যাখ্, নতুন দেহে বর্তমানে তোদের ভারতেই আছেন উনি। দেশের জন্যই তো ওঁর এই কায়াকল্পের মাধ্যমে দেহধারণ। তবে তুই যা ভাবছিস তা হবে না। জাগতিক স্থূল রাজনীতির দুনিয়ায় উনি আর কোনদিনই ফিরবেন না। যে যোগী পরমের পরশ পান তাঁর কাছে ক্ষমতার মোহ যে তুচ্ছ। তবে উনি সবার নিভৃতে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন দেশের মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য। বর্তমানে পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে যে ভ্রষ্টাচারের কালো মেঘ ছেয়ে আছে তার থেকে দেশের মানুষদের উদ্ধার করতে যে মহাত্মারা নিত্য নিয়োজিত আছেন তাঁদের মধ্যে ইনিও অন্যতম।'

মনে মনে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় কথা বলতে বলতে আমরা এগোতে লাগলাম। বেশ কিছুটা এগোনোর পর দেখলাম — একটি রন্ধ্রপথ নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই পথ ধরে বেশ কিছুটা উৎরাই নামার পর এসে পড়লাম গুহার ভিতরের একটি ছোট কক্ষে। কি ভীষণ ঠাণ্ডা যে কক্ষটি কি বলব! কক্ষের এক কোণে পাথরের বেদীর উপর সিদ্ধাসনে বসে আছেন এক যোগী। বিশালদেহী এই মহাত্মার মাথায় জটাজুট। সারা দেহ থেকে বেরিয়ে আসছে এক অদ্ভুত দীপ্তি। দেহ ঘিরে রয়েছে এক অপার্থিব আলোর বলয়। এই গুহায় প্রবেশ করে যে সুরভি সর্বপ্রথম পেয়েছিলাম তা এখানে তীব্রতর। সম্ভবতঃ এই কক্ষই সেই সুরভির উৎস।

মহাত্মার সামনে এসে রেচুং লামা হাঁটু গেঁড়ে বসলেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও হাঁটু গেঁড়ে বসলাম তাঁর পাশে। বসে সম্ভবতঃ চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই রেচুং লামা কিছু বললেন তাঁকে। কারণ তারপরই ধীরে ধীরে মহাত্মার নিমীলিত চোখদুটি খুলল। মৃদু হেসে তিনিও রেচুং লামার দিকে চাইলেন। কিছুক্ষণ দুজনেই চেয়ে রইলেন দুজনের দিকে। সম্ভবতঃ নিজেদের মধ্যে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় ভাব বিনিময় করলেন। তাঁদের সেই নীরব ভাষায় কথোপকথন বোঝার মত আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই সেই চেষ্টাও করলাম না। শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম ওই মহাযোগীর দিকে।

কিছুক্ষণ রেচুং লামার সাথে এভাবে কথা বলার পর মহাত্মা মৃদু হেসে আমার দিকে চেয়ে তাঁর ডান হাতটি বরমুদ্রার ভঙ্গীতে সামান্য তুললেন। আমিও অবনত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁকে সানন্দে নমস্কার জানালাম।

তারপরই রেচুং লামা উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় বললেন, 'চল্। গুরুজী নির্দেশ দিয়েছেন তোকে আগামীকাল যোগদীক্ষা দেয়ার জন্য। এবার আমাদের মঠে ফিরতে হবে।' বলতে বলতেই রেচুং লামা আমার হাত ধরলেন। সেই মুহূর্তেই আমি ফিরে চাইলাম সেই যোগীর দিকে। পলকের মধ্যেই তিনি দেখলাম আবার ডুবে গেছেন নিঃসীম সমাধিতে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কত উঁচুস্তরের যোগী হলে যে এরকম ইচ্ছামত পলকের মধ্যে সমাধিতে ডুবে যাওয়া যায় তা অনুভব করতে কষ্ট হল না।

অতঃপর আমরাও প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগী হলাম। রেচুং লামার সাথে এই সুমহান সাধনক্ষেত্র থেকে ধরলাম ফেরার পথ।

পাঁচ

পরদিন ভোররাতে আমার ঘরে এলেন রেচুং লামা। তখনো আমি ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। রেচুং লামাই আমাকে ঘুম থেকে তুললেন। তারপর বললেন, 'আজ থেকেই এখানে তোর সাধনা শুরু হবে। যা মঠের পিছনের প্রপাতের জলে স্নান করে আয়।'

আমি বললাম, 'সেকি? এই ভোররাতে এত শীতে স্নান করব কি ভাবে? জমে যাব যে।'

রেচুং লামা দৃঢ়ভাবে বললেন, 'কিচ্ছু হবে না। তোকে সাংগ্রীলায় আসার আগে যে সর্ষেদানার মতো বীজ খাইয়েছিলাম ওতে বছর দেড়েক শরীরে শীত অনুভব হবে না। আর শোন্ — স্নান সেরে গায়ে কোন কাপড় পরবি না। সম্পূর্ণ নগ্নদেহে আসবি আমার ঘরে।'

রেচুং লামার কথা না মেনে উপায় ছিল না। অতএব সেই ভোররাতেই মঠ থেকে বেরিয়ে প্রপাতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলাম। তাপমাত্রা তখন হিমাংকের অনেক নীচে। তবে আমার অবশ্য সামান্যতম শীতও করছিল না। বরং শেষ রাতের প্রকৃতির

সৌন্দর্য্য ভরিয়ে তুলছিল মন। সামনের প্রপাতটি বড় সুন্দর লাগছিল শেষ রাতের জ্যোৎস্নায় — যেন মনে হচ্ছিল রূপালী ধারা পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে আপন ছন্দে। প্রপাতের ধারাপতনের শব্দের ভিতর থেকে এক অপার্থিব নাদ উঠছিল। চারপাশ গুমগুম করছিল সেই নাদের অনুরণনে।

কাপড় ছেড়ে জলে নামলাম। খুবই ঠাণ্ডা বরফগলা জল। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! একটুও শীত করল না। আর এতটুকুও ঠাণ্ডা লাগল না।

স্নান সেরে নগ্নদেহেই ফিরে এলাম রেচুং লামার ঘরে। রেচুং লামা তখন ইয়াকের লোমের আসনে পদ্মাসনে বসে ছিলেন ; অপেক্ষা করছিলেন আমারই জন্য। আমাকে দেখে ইঙ্গিতে বললেন সামনের কাঠের পিঁড়িতে বসতে। আমিও সাগ্রহে তাঁর নির্দেশ মানলাম।

আমাকে দেখে মৃদু হেসে রেচুং লামা বললেন, 'দেখলি তো — আমার দেয়া বীজটির প্রভাব? এত ঠাণ্ডাতেও শীত তোকে স্পর্শ করতেই পারল না। আর করতে পারবেও না। কারণ বর্তমানে যে সাধনার জগতে তোর প্রবেশ ঘটছে তাতে প্রথমেই শীতকে জয় করতে হয়। তাই আজ প্রথমেই তোকে দেব শীতজয়ের সাধনা তথা প্রকৃতির প্রকোপ কাটিয়ে ওঠার সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়া। এই সাধনপন্থাকে বলা হয় তুম্মো সাধনা। সাংগ্রীলায় যোগসাধনা শুরুই হয় এই তুম্মো সাধনার মাধ্যমে। আর যাঁরা এই সাধনা করেন তাঁদের বলে রেস্পা সাধক।'

—'তুম্মো সাধনা কি?'

—'তুম্মো মানে তেজ। এ হল একরকম অপার্থিব তাপ যা যৌগিক প্রথায় জাগানো হয় দেহে। প্রকৃতির মধ্যে যে অপর্যাপ্ত তেজশক্তির ভাণ্ডার আছে তার থেকে তেজ আহরণ করে আপন দেহটিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হয় এবং তা আমাদের উর্য্যাশক্তির সাথে মিশিয়ে তাপ সৃষ্টি করে পুরো দেহে সমস্ত নাড়ির মধ্য দিয়ে চালনা করতে হয়। প্রথমে এই তাপ প্রতিটি খরলোর (চক্রের) মধ্যে সঞ্চার করতে হয় এবং সেই খরলো বা চক্র থেকেই এই তাপ ছড়িয়ে যায় সারা দেহে। এই সাধনার জন্য গভীর ধ্যান, মুদ্রা, প্রাণায়াম, চিন্তাভাবনার নিয়ন্ত্রণ, স্নায়ুতন্ত্র ও মনের নানা অনুশীলন এবং নানারকম ব্যায়াম করতে হয়। তাই দীক্ষার পর গুরুর তত্ত্বাবধানেই এই সাধনা করতে হয়। গুরুই শিষ্যকে দেখিয়ে দেন কিভাবে যৌগিক প্রথায় শরীরের দৈহিক, মানসিক এবং স্নায়বিক শক্তিকে ধরে রেখে তার মধ্য

থেকে এই মনো-শারিরীক উত্তাপ আহরণ করতে হয়। এইভাবে গুরু নির্দেশিত পথে কঠোর সাধনার ফলেই প্রকৃতির প্রকোপ জয় করেন সাধক।'

—'এতে আমাকে কি করতে হবে?'

—'তুম্মো সাধনার অনেকগুলি ক্রিয়া আছে। সেসবই ধীরে ধীরে শেখাব তোকে। এগুলি তোকে মন দিয়ে শিখতে হবে। কারণ শেখানোর পর তোর পরীক্ষাও নিতে হবে আমায়।'

—'পরীক্ষা? সে কি রকম?'

—'এই পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক গুরুই শিষ্যকে নিয়ে যান কোন বরফাবৃত নদীতে। সেখানে বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে শিষ্যকে তিনি বসিয়ে দেন। এই সময়ে শিষ্যকে থাকতে হয় সম্পূর্ণ নগ্নদেহে। তারপর একটি হাল্কা সুতির চাদর সেই বরফগলা জলে ভিজিয়ে গুরু শিষ্যের গায়ে জড়িয়ে দেন। শিষ্যকে তখন তুম্মো ধ্যানের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে সেই তেজ দিয়ে গায়ের চাদর শুকিয়ে ফেলতে হয়। তখন আবার গুরু আরেকটি চাদর বরফগলা জলে ভিজিয়ে তার গায়ে জড়িয়ে দেন। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে যে সবচেয়ে বেশী চাদর গায়ে শুকোতে পারে সে পরীক্ষায় প্রথম হয়। এই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ে অন্ততঃ তিনটি চাদর গায়ে শুকোতে পারলেই একমাত্র মানা হয় যে যোগী তুম্মো সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।'

—'এতো বেশ কঠিন পরীক্ষা!'

—'এর পরের স্তরে আরো কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। সেসময়ে গুরু শিষ্যকে নগ্ন দেহে বরফের প্রান্তরে বসিয়ে সারা শরীর বরফে আবৃত করে দেন। শুধু মাথাটা খোলা রাখেন শ্বাস নেয়ার জন্য। তারপর দেখা হয় — নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিষ্য কতটা বরফ নিজদেহের উত্তাপে গলাতে পারে। এইভাবে গুরু নির্দেশিত পন্থায় নিজের স্নায়ুতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসে শিষ্য। এই পরীক্ষা তো তোকেও দিতে হবে। তাই পরীক্ষা দেয়ার আগে এই সাধনের ক্রিয়াটা ভালভাবে শিখে নিতে হবে তোকে।'

—'এটাই কি এখানকার সাধনার মূল লক্ষ্য?'

—'না না। সাংগ্রীলার সাধনার মূল লক্ষ্য হল বুদ্ধত্ব। এই বুদ্ধত্ব কিন্তু আমাদের অর্জন করার বিষয় নয় — আমাদের সকলের আত্মাই শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ। সাধনার মধ্য

দিয়ে নিজের সেই অবস্থানে ফিরে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আর সাধনার মাধ্যমে এই বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠার লক্ষ্য সামনে রেখেই আমাদের যোগসাধনা চলে। সেজন্য বহিরঙ্গের জীবন থেকে মনকে নিয়ে আসতে হয় অন্তরঙ্গে।

সত্যি বলতে কি, বহিরঙ্গের এই স্থূলজগতে যা আছে তা তো সব এখানেই পড়ে থাকবে। এসব কিছুই তো তোর নয়। তোকে কিছু পেতে হলে ডুব দিতে হবে নিজের ভিতরে। নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মার সাথে চেতনার সংযোগই হল আমাদের যোগ। আত্মা নিজেই বুদ্ধ — কিন্তু মায়ার ফেরে পড়ে সে নিজেকে ভুলে গেছে। তাই নিজের ভিতরের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করা প্রয়োজন। রাত কতটা অন্ধকার বা চলার পথ কতটা কঠিন সেটা কোন বড় ব্যাপার নয়। যেটা প্রয়োজন সেটা হল — নিজের অন্তরের প্রদীপটি জ্বালানো। সেই প্রদীপ জ্বললেই অন্ধকার পথেও পেয়ে যাবি পথের দিশা নিজের মূল বুদ্ধস্বরূপে পৌঁছনোর জন্য। এই অন্তরের প্রদীপটিই জ্বালিয়ে দেয় যোগসাধনা। আমাদের এখানকার যোগসাধনার যে ছয়টি ধাপ আছে তুম্মো তার প্রথম ধাপ। এ দিয়ে সাধনা শুরু হয় মাত্র। এরপর আরো পাঁচটি স্তর পেরোতে হয়।'

—'সেগুলি কি কি?'

—'এর পরের ধাপ হল গিউ লু। এতেও ধ্যানের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। কারণ যত ধ্যানের গভীরে যাওয়া যায় তত নিজের সত্ত্বাকে অবগত হওয়া যায়। আর নিজের ভিতরকার জগৎ যত শান্ত হয় ততই নিজের আত্মস্বরূপে আত্মস্থ হওয়া যায়। তাই গিউ-লুতে গুরু বিভিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে শিক্ষা দেন যে এই দেহ শুধুই মরিচীকার মত। এর মধ্যে যা যা আছে সবই ক্ষণিকের। এটি অনেকটা ভারতীয় মায়াবাদের তিব্বতী রূপান্তর। এতে সাধনের মাধ্যমে উপলব্ধি করানো হয় — চোখের সামনে জগতের যে রূপ আমরা দেখছি তা শুধুই মায়া ; সত্য শুধু আমাদের সত্ত্বা। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব বস্তু হল মোহাবিষ্টভাবে দেখা অলীক ছায়ামূর্ত্তির মত প্রকৃত মূর্ত্তির মিথ্যা ধারাবাহিক প্রবাহ। বোঝানো হয় — যে সব বস্তু আমরা চারপাশে দেখছি বা যা যা শব্দ শুনছি সবই একইরকম মিথ্যা। আসলে এসবই হল প্রকৃত সত্যের উপর মায়ার আবরণ মাত্র। গুরু নির্দেশিত পন্থায় এই গিউ লু সাধনা যোগীকে যোগায় আত্মজ্ঞান। তখনই যোগী নিজেকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হয়। এই অবস্থায় এলে তুই উপলব্ধি করবি — যতক্ষণ নিজেকে

ভাববি রক্তমাংসের মানুষ ততক্ষণই তুই থাকবি প্রকৃতি-বশীভূত মরণশীল মৃত্যু-ভয়যুক্ত জীব। কিন্তু যখন তুই দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে আত্মায় আত্মস্থ হতে পারবি তখন আর তোর মধ্যে জীবত্ব থাকবে না। তুই তখন হয়ে যাবি দ্রষ্টা — পবিত্র চেতনাস্বরূপ। আর এই চেতনাই হল তোর মূল অবস্থা। সেখানে উপলব্ধি পৌঁছলে দেখবি — জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দিন নেই, রাত নেই ; কোথাও কিচ্ছু নেই। শুধু তুই আছিস সবকিছু জুড়ে পরমানন্দভরে।'

—'অদ্ভুত ব্যাপার তো। এমন করে তো কখনো ভাবিনি।'

—'স্বাভাবিক। সাধনা তো ভাবনার স্তর থেকে অভাবনীয় স্তরে উত্তরণেরই নাম।'

—'এই গিউ লু-র পর কি করতে হয়?'

—'এই গিউ লুর পর আসে সাধনের তৃতীয় ধাপ মি-লাম। মি-লাম হল স্বপ্নতত্ত্ব। এই স্তরে গুরু শিষ্যকে সাধনের মাধ্যমে দেখিয়ে দেন যে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা যেমন মিথ্যা তেমনই মিথ্যা হল আমাদের জেগে থাকাকালীন দেখা সকল দৃশ্য। আসলে প্রকৃতিই হল মায়ার স্বপ্ন। তাই যতক্ষণ না মানুষ মনের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মায়ার কুয়াশা অতিক্রম করছে ততক্ষণ সে অজ্ঞানের ঘুমেই আচ্ছন্ন থাকে। এই স্তরের সাধনা তাকে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসে। ফলে তার মধ্যে জাগে চেতনা। সে তখন বোঝে — চেতনাই আনন্দস্বরূপ আর অজ্ঞানের প্রভাবে যে মায়া তাকে ঘিরে রাখে তাই হল সব দুঃখের কারণ। সে তখন চারপাশের স্থূল বিভ্রমের স্বপ্ন থেকে জাগে এবং নিজ অস্তিত্বের চারপাশে জড়িয়ে থাকা স্বপ্নের মত এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে প্রকৃত মুক্তপুরুষ হয়ে ওঠে। তখনই সে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করে।'

—'তারপরই কি আসে সাধনের চতুর্থ স্তর?'

—'হ্যাঁ। তৃতীয় স্তরের সাধনে এই শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ পেলেই যোগী পৌঁছয় পরবর্তী ধাপ ওড-সালে, অর্থাৎ দিব্যজ্যোতির স্তরে। সে তখন সত্যদ্রষ্টা হয়ে ওঠে। তার মধ্য থেকে সকল সাংসারিক অশুদ্ধি চলে যায় — সে তখন দর্শন করে ব্রহ্মাণ্ডের মূল দিব্য জ্যোতিরূপ। সে উপলব্ধি করে — এই হল পরব্রহ্মের মূল সত্তা। এই মূল সত্তা থেকেই প্রতিটি স্থূলদেহে জন্ম নেয় জীবাত্মা আর জন্ম নেয়া মাত্র সে গিয়ে পড়ে মায়ার সৃষ্টি করা অজ্ঞানের অন্ধকার বলয়ের ভিতরে।

সাধনার মাধ্যমে মায়ার অন্ধকারে পূর্ণ জগতে থেকেও অন্তরে সেই আলো জাগিয়ে তুলতে পারলেই সাধক পায় সিদ্ধি।'

—'আর সিদ্ধিই তো সাধকের শেষ লক্ষ্য। তাই না?'

—'না না। তা কেন? এরপর সাধককে প্রস্তুত হতে হয় সাধনার পঞ্চম ধাপ বার্দোর জন্য। এটি হল মৃত্যু ও পরজন্মের মধ্যবর্ত্তী সময়। যদি সাধকের যথেষ্ট সাধনা না থাকে তাহলে সে তাঁর মূল সত্বার মধ্যে স্থূলদেহে থাকাকালীন যে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছিল তা মৃত্যুর পর ভুলে যায়। ফলে সে তখন অবচেতনে তলিয়ে যেতে থাকে। তখন সে জীবিতকালে যা যা মরিচীকার দুঃস্বপ্নের মাঝে ডুবে থাকত তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে এবং তা সত্য রূপে অনুভবও করতে থাকে সূক্ষ্মদেহে যতক্ষণ না তার পূর্বজন্মের কর্মফল ক্ষয় হয়। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের যোগী তাঁরা দেহত্যাগের পূর্বে নিজের ইচ্ছাশক্তির অপার্থিব প্রকাশের মাধ্যমে সমাধিতে ডুবে গিয়ে নিজ চেতনাকে সঁপে দেন সেই দিব্যজ্যোতির মাঝে। আর এভাবেই পুরোনো কাপড়ের মত দেহ ছেড়ে দিয়ে পূর্ণ জ্ঞানে সেই পরম আলোর সাথে একাত্ম হয়ে যান। এভাবেই মায়াকে অতিক্রম করে যোগী হয়ে ওঠেন অন্ধকারের আলো।'

—'তাহলে যে স্বর্গ নরকের কথা আমরা শুনি তাও কি মনের গভীরে প্রতিফলিত হওয়া স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নেরই অন্য রূপ?'

—'ঠিক তাই। দুঃস্বপ্ন হল মনের ছায়া। মন তো থাকে ঘুমন্ত, অচেতন, অজ্ঞান। মন জানে না তোর স্বরূপ কি। অথচ তাসত্ত্বেও তোকে দেখাতে চায় যে সে সবজান্তা। মন জানে না কোথায় তুই যাচ্ছিস অথচ দেখায় এমন ভাব যেন তোর লক্ষ্য সে জানে। এটাই মনের স্বভাব — জানে না কিছুই আর তাসত্ত্বেও নিজেকে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ভাবে। তাইতো জীবনে মনের ফেরে পড়লেই আসে অশান্তি। এই অশান্তি মৃত্যুর পরেও তাড়া করে। তবে এই অশান্তি সিদ্ধযোগীদের স্পর্শ করে না। তাঁরা মৃত্যুর পর পরম আলোর সাথে মিশে যান এবং অশেষ আনন্দ ও শান্তি লাভ করেন। তাকেই বলা হয় স্বর্গসুখ আর যে ভোগীরা মৃত্যুর পরও ইন্দ্রিয়ের ভোগের লক্ষ্যে অতৃপ্ত থাকে তারা সেই দিব্য আলোর পরশ হারিয়ে অন্ধকারে ডুবে যায় এবং নিজের প্রারব্ধ অনুসারে মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকে আর সূক্ষ্মদেহে তা অনুভবও করতে থাকে। সেটিই নরকযন্ত্রণা নামে পরিচিত।

আসল স্বর্গ নরক তো মানুষেরই মনে। যারা জীবনে ঘৃণা, রাগ, ইচ্ছা, হতাশা অন্তরে পুষে রাখে তারাই নরকযন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুর আগেও এবং পরেও আর যারা সত্য, প্রেম, দয়া, সরলতা অবলম্বন করে থাকে জীবনে তাদের জন্য মৃত্যুর আগে ও পরে দুদিকেই থাকে স্বর্গসুখ।'

—'তাহলে এখানকার যোগসাধকদের শেষ লক্ষ্য হল মৃত্যুর পর এই পরম আলোর স্তরে মিশে যাওয়া?'

—'ঠিক তাই। আর সেই লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হয় ফো-ওয়ার মাধ্যমে। এই ফো-ওয়া স্তর হল চেতনার রূপান্তরের স্তর।'

—'তার মানে?'

—'এই ফো-ওয়া স্তরে পৌছনো সম্ভব হয় কুণ্ডলিনী যোগে সিদ্ধিলাভের পর। এতে যোগীরা নিজের ইচ্ছামত পুরোনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন এবং তার ফলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহে যাওয়ার সময়ে যোগীদের চেতনার উপর কোন যতিচিহ্ন পরে না। সাধারণতঃ মানুষের দেহত্যাগ এবং পুনরায় দেহধারণের মধ্যে একটা বিরতি থাকে। সেই সময়ে সে আপন মানসে হয় স্বর্গসুখ ভোগ করে বা নরকযন্ত্রণা। কিন্তু যোগীরা সচেতনভাবে আপন ইচ্ছায় জীর্ণ স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে চলে যান পারমার্থিক জগতে এবং সেখানে গিয়ে গুরুকৃপা সম্বল করে মিশে যান পরম আলোর সাথে।' এই পর্যন্ত বলে একটু থামেন রেচুং লামা। তারপর বলেন, 'এবার তুই স্থির হয়ে বোস। একে একে এই ছয়টি স্তরই তোকে অতিক্রম করাব আমি। আর সেজন্যই এখন দেব তোকে যোগদীক্ষা। আর তারপর তোকে শেখাব তুম্মোর প্রাথমিক ধাপ।'

রেচুং লামার মুখে একথা শুনে আমিও সাগ্রহে স্থির হয়ে বসলাম। ভোররাতের সাংগ্রীলায় তখন তাপমাত্রা হিমাংকের অনেক নীচে। কিন্তু মঠের ভিতরে তার সামান্যতম প্রভাবও নেই। রেচুং লামা প্রথমে তিব্বতী প্রথায় আমাকে বজ্রযোগিনী তারার বীজমন্ত্র জপ করালেন। অতঃপর তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ও পরমগুরু বজ্রধারাকে প্রণাম জানিয়ে শুরু করলেন আমার যোগদীক্ষা।

যোগদীক্ষার প্রথমেই রেচুং লামা আমাকে বললেন, "আজকে তোকে শেখাব তুম্মো সাধনার প্রথম ধাপ। এই সাধনের তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি হল প্রাথমিক অংশ, দ্বিতীয়টি হল মৌলিক অনুশীলন, আর শেষেরটি হল ব্যবহারিক প্রয়োগ।

তবে আজকে শুধু প্রাথমিক ধাপটিই তোকে দেখিয়ে দেব। এই প্রাথমিক অংশের পাঁচটি অনুশীলনী আছে —

১) ধ্যানে নিজের স্থূলদেহটিকে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য দেখা।

২) নিজের দৈহিক স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্যানে অন্তঃসারশূন্য দেখা।

৩) নিজের সুরক্ষাবলয়কে ধ্যানে দর্শন করা।

৪) নিজের নাড়িগুলির পথ পরিষ্কার করা।

৫) নিজের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির উপর দিব্যতরঙ্গের সঞ্চার করা।'

আমি বললাম, 'তাহলে আমার প্রথম কাজ হল — ধ্যানে নিজের স্থূলদেহটি অন্তঃসারশূন্য দেখা। কিন্তু সেটা কিভাবে সম্ভব?'

রেচুং লামা বললেন, 'আমি তো তোর যোগের দীক্ষাগুরু। তাই প্রথমে গুরুরূপে আমাকে বন্দনা করে নে।' রেচুং লামার কথামত সবার প্রথমে আমি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গুরুবন্দনা করলাম। তারপর তিনি বলতে শুরু করলেন, 'এবার নিজের মাঝে কল্পনা কর্ বজ্রযোগিনী তারার রূপ। মঠের মধ্যে যে তারামূর্ত্তি স্থাপিত দেখেছিস তাঁকে কল্পনা কর্। মনের চোখে দেখতে থাক্ — তাঁর গায়ের রং লাল ; চুণির মতো দ্যুতি বেরোচ্ছে দেহ থেকে। দেবীর এক মুখ, দুই হাত, তিন চোখ। ডান হাতে মাথার উপর তুলে ধরেছেন ছুরি — সেই ছুরি দিয়ে যেন তোর ভিতরকার সকল দুশ্চিন্তাকে কেটে ফেলে দিচ্ছেন তিনি। বাঁ হাত দিয়ে তাঁর বুকের কাছে ধরা আছে একটি মড়ার খুলি — খুলিটি রক্তে ভরা। মাথায় পাঁচটি শুকনো খুলির মুকুট। গলায় পঞ্চাশটি ছিন্ন নরমুণ্ড। সেই নরমুণ্ড থেকে ঝরছে বিন্দু বিন্দু রক্ত। নৃত্যের ভঙ্গিমায় আছেন এই ষোড়শী দেবী। ডান পা সামনে ঝুঁকে এবং বাঁ পা তাঁর শক্তিমানের বুকে স্থাপিত। নিজের দেহটিকে এই দেবীর রূপে কল্পনা কর্। আর সেইসাথে মনে কর্ তোর ভিতরটা সম্পূর্ণ ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে। ভিতর থেকে একটা স্বচ্ছ জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। শুরুতে এই কল্পনা করবি তোর দেহের আয়তন অনুযায়ী। তারপর নিজেকে একইরূপে ভাববি প্রথমে এই মঠের উচ্চতায়, তারপর সামনের ওই পাহাড়ের উচ্চতায়, তারপর কল্পনা করবি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করছে তোর এই মূর্ত্তি। তারপর তাতেই মনোসংযোগ করবি। যতক্ষণ না আমি পরবর্ত্তী নির্দেশ দিচ্ছি এভাবেই ধ্যানে ডুবে থাক্।'

আমি ঠিক তাই করলাম। এক অদ্ভুত উপলব্ধি হতে লাগল। আমি যেন আর

আমি নেই। সেই বিরাট দেবীর ছায়ারূপ যেন হয়ে গিয়েছি আমি। এছাড়া আমার যেন নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। দেখতে দেখতে বিরাট হয়ে যেতে লাগল সেই রূপ। প্রায় দশ মিনিট ধরে নিজের মাঝে দেবীর বিরাট রূপের এই ধ্যান করলাম আমি। দেখতে দেখতে ডুবে গেলাম ধ্যানের মধ্যে। অনুভব হতে লাগল — কোথাও যেন আর কেউ নেই। শুধু দেবীর রূপটিই রয়েছে সবকিছু জুড়ে। কিছুক্ষণ এভাবে ধ্যানের মধ্যে ডুবে থাকাকালীনই মনের ভিতর থেকে ভেসে এল রেচুং লামার নির্দেশ, 'এবার নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে ফেল্। আস্তে আস্তে ছোট করে আনতে থাক্ নিজের দেবীরূপ। দেখতে দেখতে শস্যদানার মত আকৃতিতে নিয়ে আয় নিজের কল্পনা। এবার তার মধ্যে মনোসংযোগ কর্।'

রেচুং লামার নির্দেশমত তাই করলাম। বিরাট রূপ থেকে চলে এলাম ক্ষুদ্ররূপের কল্পনায়। আর তখনই অনুভব করলাম — মনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! মনোসংযোগ করে যেমনটি ভাবছি তেমনটিই দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে — নিজে আর আমি যেন নিজের মধ্যে নেই। যে দেবীর রূপ কল্পনা করছি তাঁর রূপই যেন ধারণ করেছে আমার সূক্ষ্ম অবয়ব।

কিছুক্ষণ পর আবার আমার অন্তরে ভেসে উঠল রেচুং লামার নির্দেশ, 'এবার নিজের ভিতরে মনোসংযোগ কর্। দেখতে থাক্ — তোর এই বায়বীয় দেহের ভিতরে রয়েছে অসংখ্য নাড়ি। এই নাড়িগুলিকে আমাদের তিব্বতি ভাষায় বলে 'সা'। মূলতঃ তিনটি নাড়িকে নিয়েই আমাদের এই সাধনা — উমা সা (সুষুম্না নাড়ি — যা মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে উঠে গেছে উপর পানে), রোমা সা (পিঙ্গলা নাড়ি — যা মেরুদণ্ডের ডানদিক দিয়ে মেরুদণ্ড বেষ্টন করে উঠে গেছে উপরপানে) আর কেয়াংমা সা (ইড়া নাড়ি — যা মেরুদণ্ডের বাঁদিক দিয়ে মেরুদণ্ডকে বেষ্টন করে উঠে গেছে উপরপানে)। এই রোমা সা আর কেয়াংমা সা সর্পিনীর মত জড়িয়ে আছে উমা-সাকে। এই তিনকে নাড়িকে সম্পূর্ণ ফাঁপারূপে কল্পনা কর্। ভাবতে থাক — তোর বহিরঙ্গে রয়েছে দেবীর রূপ আর ভিতরে মেরুদণ্ডের নীচ থেকে ভ্রূমধ্যের আজ্ঞা চক্র অবধি এই তিনটি নাড়ির শুধু অস্তিত্ব আছে। মেরুদণ্ডের মাঝে স্থিত উমা সা নাড়িটিকে কল্পনা কর — যেন দ্রবীভূত লাক্ষার মত লাল, প্রদীপের শিখার মত উজ্জ্বল, লাঠির মত সোজা এবং গোল করে মোড়া কাগজের মত ফাঁপা। প্রথমে এই উমা সা তথা সুষুম্নার ধ্যান কর্ এটিকে নলখাগড়ার মত

আয়তনবিশিষ্ট ভেবে। তারপর আস্তে আস্তে কল্পনায় এটিকে বড় করে দেখতে থাক্ — প্রথমে প্রস্থে জাদুদণ্ডের মত, তারপর থামের মত, তারপর মিনারের মত, এবং তারপর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত। এই কল্পনা শুধু কেন্দ্রীভুত রাখ্ নিজের মেরুদণ্ডের মধ্যে স্থিত উমা সা তথা সুষুম্না নাড়িটির উপর। আর মনে করতে থাক্ — এই নাড়িটির ভেতর থেকে এক দিব্যজ্যোতি যেন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে তোর সমস্ত শরীরে।'

রেচুং লামার নির্দেশমত বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই ধ্যান করলাম। দেখতে দেখতে আবার যেন হারিয়ে গেলাম এক অন্য জগতে। নিজের দেহের ভিতরের নাড়িগুলো যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম। অবাক হয়ে ভাবছিলাম — আমার চেনা 'আমি'র ভিতরে বসে রয়েছে এ কোন অচেনা 'আমি'?

কিছুক্ষণ পর আবার অন্তরে জেগে উঠল রেচুং লামার কণ্ঠস্বর, 'এবার আমরা আসব এই প্রাথমিক অংশের তৃতীয় ভাগে — নিজের সুরক্ষাবলয়ের ধ্যান। পদ্মাসনে বসে প্রথমে তিনবার শ্বাস ছাড়্। তারপর ফুসফুসের নীচ থেকে বুক ভরে গভীর শ্বাস নিয়ে যতক্ষণ সম্ভব ধরে রাখ্। যখন একান্তই শ্বাস ছাড়তে হবে তখন মনে মনে ভাব — তোর দেহের প্রতিটি রোমকূপ থেকে এক দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে আসছে আর তার প্রভায় ভরে যাচ্ছে সারা পৃথিবী। আবার যখন শ্বাস নিচ্ছিস সেই জ্যোতি দেহের ভিতরে ঢুকে আসছে প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে এবং সমস্ত দেহটিকে ভরিয়ে তুলছে আপন আভায়। এটি সাতবার কর।'

রেচুং লামার নির্দেশমত তাই করলাম আমি। তারপর আবার লামা বললেন, 'এবার মনে কর্ — যখন শ্বাস ভিতরে আসছে এই জ্যোতির মধ্য থেকে প্রকট হচ্ছে হং বীজ আর যখন শ্বাস ছাড়ছিস তখন সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ছে এই হং বীজ। আবার যখন শ্বাস নিচ্ছিস তখন তোর ভিতরটাও হং বীজময় জ্যোতিতে ভরে যাচ্ছে। এই ধ্যানটিও সাতবার কর্।'

এই ধ্যানও রেচুং লামার নির্দেশমত সাতবার করলাম। তারপর আবার তিনি জানালেন, 'এবার মনে কর্ — এই হং বীজ পরিবর্তিত হচ্ছে এক ক্রুদ্ধ তেজদীপ্ত শক্তিমান দেবতার মূর্ত্তিতে — অস্ত্রসমেত ডান হাত মাথার উপরে তোলা, বাঁ হাত ভয়প্রদর্শনের ভঙ্গীতে রাখা আছে বুকের কাছে। শ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে ধ্যান করতে থাক্ — এই দেবতা তোর দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সমগ্র জগৎ

ব্যাপ্ত করে দাঁড়াচ্ছেন। আবার যখন শ্বাস গ্রহণ করবি মনে করতে হবে — তিনি তোর দেহে প্রবেশ করে সমস্ত দেহ জুড়ে প্রকট হচ্ছেন। এটাও সাতবার কর।'

রেচুং লামার নির্দেশমত এই পন্থাটিও সাতবার অনুসরণ করলাম। আর আশ্চর্য্যের ব্যাপার — চারপাশের পরিবেশের এমনই প্রভাব যে যখন যেই ধ্যানে মনোসংযোগ করছি তার মধ্যেই ডুবে যাচ্ছি আর এক অদ্ভুত আনন্দের শিহরণ খেলে যাচ্ছে সারা দেহে।

অতঃপর রেচুং লামা বললেন, 'এবার ধ্যান কর্ — তোর প্রতিটি রোমকূপ থেকে এমন অসংখ্য তেজদীপ্ত দেবতা প্রকট হচ্ছেন এবং সবাই মিলে তোকে ঘিরে এক জ্যোতির কবচের রূপ ধারণ করছেন। অনুভব কর্ — এই জ্যোতির কবচ তোকে সকল অশুভ স্থূল শক্তি থেকে রক্ষা করছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে রেচুং লামার কথামত এই ধ্যানটিও করলাম। ধ্যান করতে করতেই অনুভব করতে লাগলাম — আমার সমস্ত শরীর জুড়ে যেন শক্তিপ্রবাহ বইছে। নিজের মধ্যে সত্যিই এক সুরক্ষাকবচের অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর আবার মনে জেগে উঠল রেচুং লামার নির্দেশ, 'এবার আসি নাড়ির পথ পরিষ্কার প্রসঙ্গে। এখন উমা সা বা সুষুম্না নাড়ির ডানদিকে অবস্থিত রোমা সা বা পিঙ্গলা নাড়ি এবং তার বাঁদিকে অবস্থিত কেয়াংমা সা বা ইড়া নাড়ি দুটিকে চিন্তা কর্ মনে মনে। চিন্তা কর্ যে এই দুই নাড়িই ফাঁপা। এই দুই নাড়ির উপরিভাগের শেষাংশ ভ্রূমধ্যের উপর দিয়ে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে গোলাকার পথে ঘুরে শরীরের দুপাশ দিয়ে নেমে মেরুদণ্ডের নিম্নতম স্তর মূলাধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। মনে কর্ — বাঁদিকের নাড়িতে রয়েছে সংস্কৃতের সকল স্বরবর্ণ। আর ডানদিকের নাড়িতে রয়েছে সব ব্যঞ্জনবর্ণ।

এবার মনশ্চক্ষে চিন্তা কর্ যে এই বর্ণগুলির বাইরের রেখাগুলি পদ্মফুলের তন্তুর মত কোমল। সকল বর্ণগুলিই ঘন লাল এবং একে অপরের উপর ঋজুভাবে অবস্থান করছে। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে এই বর্ণগুলির উপর মনোসংযোগ কর্ এবং চিন্তা কর্ যে এই বর্ণগুলি যেন শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে শ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে। তারপর একইভাবে শ্বাস গ্রহণ করার সময়ে অনুভব কর্ যে এই বর্ণগুলি যেন শরীরে প্রবেশ করছে দেহের সৃজক অঙ্গের রন্ধ্রপথ দিয়ে। মনে মনে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে যথাক্রমে এই বর্ণের জপমালার যাওয়া-আসার উপর মনকে নিবিষ্ট করে

ধ্যান করতে থাক্।'

বুঝতে অসুবিধা হল না — জলাশয় তৈরী করতে গেলে আগে যেমন জলপ্রবাহকে ধরে রাখার জন্য খাত খনন করতে হয় তেমনই যোগের শক্তিকে নিজের মধ্যে ধরে রাখার জন্য এই ক্রিয়াগুলি দিয়েই নিজেকে তৈরী করতে হয়। অতএব আমিও সানন্দে এইভাবেই রেচুং লামার নির্দেশমত ধ্যানে ডুব দিলাম।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধ্যান করতে করতে যখন প্রায় তন্ময় হয়ে গিয়েছি তখন আবার লামার নির্দেশ জেগে উঠল মনে, 'এবার আমরা তুম্মো সাধনার প্রাথমিক অনুশীলনের শেষ ধাপে এসে পড়েছি। এবার নিজের নাড়িগুলির মধ্যে দিব্যজ্যোতির আশীর্বাদস্বরূপ দিব্যতরঙ্গ সঞ্চার করতে হবে। কারণ আমাদের দেহে মলমূত্রসহ অনেক বর্জ্যবস্তু থাকে। এর শুদ্ধি না হলে সাধনপথে এগোনো সম্ভব হবে না। তাই অপার্থিব দিব্যজ্যোতির তরঙ্গ নিজের মধ্যে সঞ্চার করে নাড়িশুদ্ধি করে নিতে হয়। এজন্য প্রথমেই জ্যোতির আধারস্বরূপ উমা সা বা সুষুম্নার কেন্দ্রস্থলে বুকের কাছে স্থিত অনাহত চক্রের উপর মনোনিবেশ কর্। আর মনে মনে চিন্তা কর্ যে তোর দীক্ষাগুরু (অর্থাৎ আমি) থেকে শুরু করে তোর গুরু পরম্পরার সকল গুরু পরপর বসে আছেন যোগাসনে একটি কাল্পনিক লম্বরেখায়। অনাহত চক্রে তোর বর্তমান গুরু অর্থাৎ আমি, আমার উপরে বসে আছেন তোর পরমগুরু — যাকে কাল ওই গুহায় সমাধিস্থ দেখেছিস। এভাবে আরো কিছু অবয়বহীন জ্যোতির্ময় গুরুমূর্ত্তি কল্পনা করবি — যাঁরা আমাদের গুরু পরম্পরায় পরপর আছেন। তবে যেহেতু তুই তাঁদের দেখিসনি তাই তোকে তাঁদের মুখ কল্পনা করতে হবে না। শুধু কল্পনা করবি তাঁদের জ্যোতির্ময় ধ্যানস্থ মূর্ত্তি। আর সবার উপরে থাকবেন আমাদের সকল যোগীর পরমারাধ্য যোগীরাজ বজ্রধারা। একটি মুক্তোর মালার মত পরপর অবস্থানকারী এই গুরুদের ধ্যান কর্ এবং তাঁদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে প্রার্থনা করতে থাক্।'

রেচুং লামার কথামত এভাবেই ধ্যান করতে লাগলাম আমি। সত্যিই এক আশ্চর্য্য অনুভূতি হতে লাগল। কল্পনার সাথে সাথে বুকের মাঝখানে স্থিত অনাহত চক্র থেকে ভ্রূমধ্যে স্থিত আজ্ঞাচক্র অবধি গুরুদের জ্যোতির বলয় প্রকট হতে লাগল। আর সেই জ্যোতির মধ্য থেকে এক অপার্থিব শিহরণ ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা দেহে। সাংগ্রীলার নিস্তব্ধ নিরালা কক্ষে এই ধ্যান করতে করতে নিজের

ভিতরে এক অপার্থিব শক্তির জাগরণ অনুভব করতে লাগলাম।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে ধ্যান করার পর আবার আমার ভিতরে জেগে উঠল রেচুং লামার নির্দেশ, 'খুব সুন্দর হচ্ছে তোর ধ্যান। এবার এভাবে ধ্যান করতে করতেই কল্পনা কর্ — সকল গুরুরা একে একে তোর নিজের গুরুর মধ্যে — অর্থাৎ আমার মধ্যে মিশে যাচ্ছেন। তারপর মনে কর — আমিও যেন এক অপূর্ব জ্যোতিরূপ ধারণ করেছি। সেই অপূর্ব জ্যোতি যেন তোর সারা শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে এক অপার্থিব আনন্দের অনুভূতি। অনুভব কর্ এক শুদ্ধ আনন্দের ধারায় ধুয়ে যাচ্ছে তোর ভিতরকার সকল অশুদ্ধি। গুরুদের আশীর্বাদে ভরে উঠছিস তুই পরমানন্দের পরম পবিত্র আবেশে।'

রেচুং লামার নির্দেশমত এই প্রারম্ভিক ভাগের শেষ ধ্যানে এবার মনোসংযোগ করলাম। আর কিমাশ্চর্য্যম! রেচুং লামার নির্দেশমত ধ্যান করতে করতে স্পষ্ট দেখলাম — সেই সকল গুরুশক্তি ধীরে ধীরে মিশে গেল আমার গুরুর মধ্যে এবং তারপর আমার গুরু রেচুং লামার মূর্তিটিও ধারণ করল জ্যোতিরূপ। আমি সেই দিব্যজ্যোতি স্পষ্ট দেখতে পেলাম দুচোখের মাঝে। আজ্ঞাচক্রে সেই জ্যোতির আভা দর্শনের সাথে সাথে মনে সঞ্চারিত হতে লাগল এক দিব্য আনন্দের জোয়ার। নিজের মাঝে নিজেকেই যেন হারিয়ে ফেললাম আমি।" বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন লামা। বুঝিবা নিজের দীক্ষার দিনের সেই অপার্থিব অনুভূতি আবার তাঁর চোখের সামনে ফিরে এল স্মৃতিচারণের পথ ধরে।

ছয়

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

লামা হাসলেন, "তারপর এভাবেই কেটে গেল এক বছর। প্রথম এক বছরে আমার জন্য শুধু এটুকুই নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিলেন আমার গুরুজী রেচুং লামা। তাই এক বছর ধরে তুম্মো সাধনার এই প্রাথমিক ক্রিয়াটুকুই করে গেছি সানন্দে। আর করতে করতেই অনুভব করেছি — আমার ভিতরে এক অদ্ভুত পরিবর্তনের জোয়ার। সারাক্ষণই ধ্যানের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করতাম। খাওয়া আর শোওয়া বাদ দিলে ধ্যানই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন।

এই এক বছরে সাংগ্রীলা মঠের দৈনন্দিন জীবনের সাথেও ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। প্রতিদিন মাঝরাতে উঠে ক্রিয়া দিয়ে দৈনন্দিন কর্মসূচির প্রারম্ভ। তারপর ভোররাতে স্নান সেরে ব্রাহ্মমুহূর্তে সাংগ্রীলার সকল মঠবাসীকেই প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে বজ্রযোগিনী তারাদেবীর আরাধনা করতে হয়। প্রায় ঘন্টা দুয়েক আরাধনার পর আসে পাঠের পর্ব। এসময়ে সবাইকেই আপন আপন কক্ষে বৌদ্ধ পুঁথি পাঠ করতে হয়। এই বৌদ্ধ পুঁথির মধ্যে পৃথিবীর সকল গুপ্তবিদ্যার মন্ত্র ও প্রয়োগবিধিই আছে। তাই এগুলি অধ্যয়ন নিত্যকর্মের মধ্যেই পড়ে। অতঃপর আসে ভোজনের পালা। এমনিতে সাংগ্রীলায় অধিকাংশ লামাই যোগসিদ্ধ এবং বাতাসভুক। তাই তাঁদের খাদ্যে-পানীয়ের প্রয়োজন পড়ে না। তবে আমার মত নবাগতদের জন্য দিনে একবার খাদ্যযোগের ব্যবস্থা আছে। সেই খাদ্য গ্রহণ করে প্রত্যেককেই মধ্যাহ্নে যেতে হয় তাঁদের গুরুর কাছে সাধনার পাঠ নেয়ার জন্য। সন্ধ্যাবেলায় আবার প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে সবাইকে সান্ধ্য প্রার্থনা করতে হয় বজ্রযোগিনী তারাদেবীর বিগ্রহের সামনে। তারপর নবাগতদের নৈশকালীন ভোজনের পালা আসে। এরপর প্রথমে কিছুক্ষণ বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ হয় ও তারপর চলে যোগাভ্যাস। রাতের প্রথম প্রহরেই যোগাভ্যাস সেরে শুয়ে পড়তে হয়। এভাবেই চলতে লাগল আমারও সাধনার প্রথম বছর।

দেখতে দেখতে সবার সাথে পরিচয়ও হল। কিন্তু সাধনজীবন যে শুধুই নিজেকে নিয়ে। তাই পরিচয় সবার সাথে হলেও শুধুমাত্র গুরুজী রেচুং লামা ছাড়া কারো সাথেই তেমন ভাব বিনিময় হত না। ওখানে সবাই যে শুধু নিজেকে নিয়েই ডুবে থাকেন সাধনায়। সাংগ্রীলা যে সাধনভূমি। শুধু সাধনা ছাড়া এই মঠে কেউই কোনদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আমিও ছিলাম না ব্যতিক্রম। দেখতে দেখতে এভাবেই কেটে গেল একটি বছর।

এক বছর বাদে আবার একদিন রাতে আমায় গুরুজী রেচুং লামা বললেন, 'এতদিনে প্রাথমিক সাধনায় তুই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিস। আগামীকাল ভোররাতে তোকে দেখাব তুম্মো সাধনার মৌলিক অংশটি। তাই রাত সাড়ে তিনটের মধ্যে স্নান সেরে চলে আসবি আমার কাছে।'

এতদিনে বুঝেছি — সাধনজগতে গুরুবাক্য বেদবাক্য। এতদিন ধরে ক্রমাগত প্রাথমিক অনুশীলন করে আসার পর তুম্মো সাধনার মূল অংশের পাঠ নেয়ার জন্য

আমিও ব্যস্ত ছিলাম। অতএব পরবর্ত্তী মধ্যরাতেও আগের বারের মতই প্রপাতের হিমশীতল জলে স্নান করে যথারীতি নিরাবরণ দেহে গেলাম গুরুজীর কাছে। গুরুজী নিজের ইয়াকের লোমের আসনে বসেছিলেন। তাঁর সামনে রাখা ছিল আরেকটি ইয়াকের লোমের আসন। গুরুজী আমাকে ইঙ্গিতে ওখানেই বসতে বললেন। তারপর তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। অতএব আমিও ধ্যান শুরু করলাম। আর ধ্যানের মধ্যেই পেলাম তাঁর নির্দেশ, 'আজ তোকে শেখাব তুম্মো সাধনার মৌলিক অংশ। প্রথমেই পদ্মাসনে বসে নে।'

আমি তাই করলাম। তারপর গুরুজী ধ্যানস্থ অবস্থায় আমার অন্তরে পাঠাতে শুরু করলেন সাধনার নির্দেশ। কিন্তু গুরুজী যেভাবে আমাকে হাতে ধরে একের পর এক স্তরের সাধনা শিখিয়েছিলেন তা এভাবে সবিস্তারে বলতে গেলে সারারাত কেটে যাবে। আর তা শুনেই বা কি লাভ হবে তোমার? হাতে ধরে দেখিয়ে না দিলে তো তুম্মো সাধনা করা সম্ভবও নয়।" এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা।

আমি মৃদু হেসে বললাম, "তবু তুম্মো সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলে ভাল লাগত। এই সাধনতত্ত্ব তো কোথাও জানতে পারা যায় না। আর সেই জ্ঞান যদি আপনার মত সাংগ্রীলার গুপ্তযোগীর থেকে পাওয়া যায় তবে তো মন ভরে উঠবে আনন্দে। অবশ্য আমাকে আনন্দ দেবেন না নিরাশ করবেন সেটি আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম।"

"খোকাবাবুর অভিমান হল নাকি?" মৃদু হাসলেন লামা, "আচ্ছা, এভাবে যখন বললে, তখন তোমায় খুলে বলছি সেই সাধনতত্ত্বের কথা। কিভাবে পরপর তুম্মো সাধনার স্তর অতিক্রম করতে হয় তা সংক্ষেপে বলছি।

সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে গুরুজীর কৃপায় আমার তুম্মো সাধনার হাতেখড়ি হল। গুরুজী প্রথমেই আমাকে দেখিয়ে দিলেন শান্ত শ্বাস প্রণালী। এই পদ্ধতিতে প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে বুকে যথাসম্ভব শ্বাসগ্রহণ করে সেটি ধরে রাখতে হয়। এর ফলে দেহের মধ্যচ্ছদা নিমীলিত হয় ও তলপেটসহ নাভি সংকুচিত হয়। সেইসাথে শ্বাসের প্রবাহপথ নেয় ধনুকের আকার। এরপর কোন শব্দ না করে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে ১৬ আঙুল দূরত্ব থেকে শ্বাস টেনে আনতে হয়। অতঃপর এই শ্বাসকে ফুসফুসের নীচের দিকে ঠেলে দিয়ে মধ্যচ্ছদাকে সংকুচিত করে বুক প্রসারিত করতে হয়। এইসময়ে চিবুক বুকে ঠেকিয়ে হাতদুটো নাভিতে রেখে আর হাতের কব্জি উরুতে ঠেকিয়ে

চোখের কোণ পরিবর্তন না করে শ্বাস নিতে হয় ও ছাড়তে হয়। এইসময়ে শুধু শ্বাস প্রশ্বাসের উপরই সীমাবদ্ধ রাখতে হয় মনের চিন্তাপ্রবাহ আর দুচোখের দৃষ্টি রাখতে হয় ভ্রূমধ্যে।

এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর মাথা আস্তে আস্তে ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে তিনবার শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। তারপর ঠিক উল্টো করে বাঁদিক থেকে মাথা ডানদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বাঁ নাসারন্ধ্র দিয়ে আবার তিনবার শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। আর সবশেষে মাথা সোজা রেখে দুই নাসারন্ধ্র দিয়েই তিনবার শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এইভাবে তুম্মোর প্রথম স্তরের প্রাণায়াম করতে হয়। একে বলে শান্ত শ্বাস-প্রণালী।

শান্ত শ্বাস প্রণালীর পর অনুশীলন করতে হয় উগ্র শ্বাস প্রণালী। এটি হল মনস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের দ্বিতীয় স্তর। এর আছে পাঁচটি পর্য্যায় — এতে প্রথমে বারো বার শব্দ করে শ্বাস ত্যাগ করতে হয়। তারপর স্বাভাবিকভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে হয় বারোবার যাতে স্বাভাবিক নিয়মে ফুসফুসের শিরা উপশিরা বাতাসে পরিপূর্ণ হয়। তারপর বুকে বাতাস ভরে বারোবার ফুসফুসের সর্বাধিক সম্প্রসারণ করতে হয়। এতে আত্মিক শক্তি উৎপন্ন হয় দেহে। এভাবে অনুশীলন করলে শ্বাসক্রিয়াকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত্ব করা যায় আর মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে দেহের সব নাড়ি। সবশেষে ঢিমেতালে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ বারোবার করতে হয় যা একইসাথে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অতঃপর আসে মনস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের প্রক্রিয়ার প্রথম ভাগের শেষ পর্য্যায় — ধ্যানের মধ্য দিয়ে মনে ইষ্টদেবীকে কল্পনা করে মনস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের প্রণালী। এই পর্য্যায়ের তিনটি ভাগ আছে — ১) বাহ্যিক মনঃস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদন, ২) আভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদন এবং ৩) প্রচ্ছন্ন মনঃস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদন।

বাহ্যিক মনঃস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের জন্য প্রথমে নিজের বহিরঙ্গে বজ্রযোগিনী তারার স্বচ্ছ সূক্ষ্ম দেহের একটা চিত্র কল্পনা করে তাতে ধ্যান করতে হয়।

তারপর আভ্যন্তরীণ মনঃস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের জন্য সেই স্বচ্ছ দেহের কেন্দ্রে ঋজু এবং ফাঁপা মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি নাড়ি কল্পনা করতে হয়। এই ফাঁপা অন্তঃসারশূন্যতা হল বাস্তবে যে শূন্যতা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে তারই প্রতীক। এর রং লাল যা আনন্দের প্রতীক। এই অবয়ব যেমন স্বচ্ছ তেমনই উজ্জ্বল। এই

মেরুদণ্ডে স্থিত উমা সা বা সুষুন্না নাড়ি হল জীবনবৃক্ষের প্রতীক — এর মাধ্যমেই ঘটে জীবন থেকে মহাজীবনে উত্তরণ। এই পর্য্যায়ে মূলাধার চক্র থেকে সহস্রার চক্র অবধি বিস্তৃত এই নাড়িটির ধ্যান করতে হয় তার চারটি বৈশিষ্ট্যের সাথে — ঋজুতা, স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা, রক্তিম বর্ণ ও শূন্যতা। মনে ধ্যান করতে হয় — মূলাধার চক্র থেকে উঠছে এই নাড়ি। এর দুটি প্রান্ত সমান ও মসৃণ। এটি উঠে যাচ্ছে মস্তিষ্কের সহস্রার চক্রে এবং তারপর তা বিস্তৃত হচ্ছে মস্তিষ্কের উপরভাগে এবং মুখমণ্ডলের সামনের দিকে এসে দুই নাসারন্ধ্রে তার যাত্রা শেষ করছে। সাথের দুই নাড়ি ডানদিকে রোমা সা (পিঙ্গলা নাড়ি) ও বাঁদিকে কেয়াংমা সা (ইড়া নাড়ি) গোলাকারে ঘুরে সুষুন্না নাড়ির নিম্নভাগের সাথে মিলে যাচ্ছে।

অতঃপর ধ্যান করতে হয় — মস্তিষ্কে যেখানে এই তিন নাড়ি মিলিত হয়েছে সেখানে রয়েছে সহস্রার চক্র। চিন্তা করতে হয় — এই সহস্রার থেকে ৩২টি দ্যুতিমান নাড়ি নীচের দিকে বেরিয়ে আসছে। প্রথমে কণ্ঠে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্র থেকে উর্দ্ধমুখে ১৬টি দ্যুতিমান নাড়ি উঠছে, হৃদয়ে অবস্থিত অনাহত চক্র থেকে ৮টি দ্যুতিমান সহায়ক নাড়ি নীচের দিকে নামছে এবং নাভিতে অবস্থিত মণিপুর চক্র থেকে ৬৪টি নাড়ি বেরিয়ে উর্দ্ধপানে যাচ্ছে। এই প্রতিটি চক্র থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িগুলি অনেকটা ছাতার পাঁজরের মত। আর তার সংযোজক অংশগুলি হল উমা সা, রোমা সা ও কেয়াংমা সা। (সুষুন্না নাড়ি, পিঙ্গলা নাড়ি ও ইড়া নাড়ি) অতঃপর চিন্তা করতে হয় — যেখানে রোমা সা বা পিঙ্গলা নাড়ি ও কেয়াংমা সা বা ইড়া নাড়ি এসে মিলেছে সুষুন্না নাড়ির সাথে, অর্থাৎ নাভির চার আঙুল নীচে ওখানে ত্রিকোণ মণ্ডলে একটি শুকনো চুলের মত অংশ দেখা দিয়েছে। এর বর্ণ লালচে খয়েরী এবং উচ্চতা আধ আঙুলের সমান। মনে ভাবতে হয় — এটি যেন ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং স্পর্শ করলে তার থেকে তাপ অনুভব করা যাচ্ছে। এই ত্রিকোণমণ্ডল যেন বাতাসের ছোঁয়ায় 'ফেম ফেম' শব্দ তুলে ঢেউ-এর মত দুলছে।

তারপর চিন্তা করতে হয় — সহস্রার চক্রে যেখানে সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম রয়েছে সেখানে সুষুন্না নাড়ির সীমান্তে শ্বেতবর্ণের হং বীজ দেখা যাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে সেখান থেকে ঝরে পড়বে অমৃতের কণা। এরপর শ্বাস নিতে নিতে ভাবতে হয় — প্রাণশক্তি প্রবেশ করছে রোমা সা ও কেয়াংমা সাতে (অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়িতে)। তখন অনুভব হয় বুকে বায়ু প্রবেশের ফলে এই নাড়িদুটি স্ফীত হয়ে

উঠছে, প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে সুষুম্না নাড়িতে, তা এসে ধাক্কা দিচ্ছে সেই শুকনো চুলের মত ত্রিকোণ ক্ষেত্রে এবং সেটিকে ভরিয়ে তুলছে লাল আভায়। যতক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে ততক্ষণ পুরো পদ্ধতিটির উপর গভীর মনোনিবেশ করতে হয় — শ্বাস ছাড়ার সময় মনে করতে হয় যে শরীরের বর্জ্য পদার্থ যেন শ্বাসের সাথে সাথে দুই নাসারন্ধ্র দিয়ে একটি নীলচে ধারার মত বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

তখন মনকে একাগ্র করতে হয় ওই ত্রিকোণ ক্ষেত্রে। চিন্তা করতে হয় যে ওখান থেকে একটি আধ আঙুলের সমান তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা জ্বলে উঠছে। এই অগ্নিশিখাও উমা সা বা সুষুম্না নাড়ির মত ঋজু, স্বচ্ছ উজ্জ্বল, লালবর্ণ ও শূন্যতাবিশিষ্ট। অনেকটা ঘূর্ণায়মান চরকার টাকুর মত দেখতে লাগে একে। এই সময়ে চিন্তা করতে হয় — প্রতিটি শ্বাসের সাথে এই শিখা আধ আঙুল করে উপরে উঠছে এবং আটটি এরকম শ্বাস-প্রশ্বাসের পর এটি এসে পৌঁছচ্ছে নাভির স্নায়ুকেন্দ্রে। এরকম দশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের পর অনুভব হয় — নাভিপদ্মের নাড়িকেন্দ্রের সকল দলগুলি এই মনস্তাত্ত্বিক আগুনে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

তারপর আরো দশটি শ্বাস নিতে নিতে অনুভব করতে হয় — এই আগুন নীচের দিকে নেমে গিয়ে শরীরের নিম্নাঙ্গের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি পায়ের আঙুলের শীর্ষদেশ অবধি ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এরপর আরো দশটি শ্বাস নিতে হয় আর অনুভব করতে হয় — এই অগ্নিশিখা উর্দ্ধমুখী হয়ে অনাহত চক্র পর্যন্ত শরীরের উপরিভাগের সমস্ত অঙ্গগুলিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অতঃপর আরো দশটি শ্বাস এভাবে নিতে নিতে অনুভব করতে হয় যে এই অগ্নিশিখা বিশুদ্ধ চক্র অবধি পৌঁছে যাচ্ছে।

তারপর আরো দশবার শ্বাস নিতে হয় আর অনুভব করতে হয় যে এই অগ্নিশিখা পৌঁছে যাচ্ছে সহস্রারে।

এরপর আরো দশবার শ্বাস নিতে হয় আর অনুভব করতে হয় — সহস্রারে যে হং বীজ রয়েছে তা এই আগুনে গলে যাচ্ছে এবং তার থেকে দেহের ভিতরের অমৃতরস বা চন্দ্ররসের ক্ষরণ হচ্ছে এবং এই অমৃতরসে মস্তিষ্কের নাড়িগুলি পূর্ণ হয় উঠছে। এরপর আবার দশবার শ্বাস নিতে নিতে অনুভব করতে হয় যে কণ্ঠের

বিশুদ্ধ চক্রের সকল নাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অমৃতরসে। পরের দশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে অনুভব করতে হয় যে হৃদয়ের অনাহত চক্রের সকল নাড়ি পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অমৃতরসে। তার পরের দশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে অনুভব করতে হয় নাভিপদ্মের সকল নাড়ি প্লাবিত হচ্ছে অমৃত রসে। শেষের দশটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে অনুভব করতে হয় দেহের নিম্নাঙ্গের সকল নাড়ি পূর্ণ হয়ে গেছে অমৃতরসে।

এই যে দহন ক্রিয়ার পর দোহন ক্রিয়া করতে হয় এর ১০৮ বার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথম-প্রথম এই ক্রিয়া দিনে ও রাতে ছয়বার করে করতাম আমি। তারপর আস্তে আস্তে এই পুনরাবৃত্তির সংখ্যা কমিয়ে এনেছিলাম চারে। শুধু খাওয়ার সময় এবং ঘুমের সময় ছাড়া এই প্রক্রিয়া সমানভাবে চালিয়ে যেতাম নিরবচ্ছিন্নভাবে। সাংগ্রীলায় এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেহ, মন এবং জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য মনস্তাত্ত্বিক তাপ সৃষ্টি করা হয়।'' এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা।

তৎক্ষণাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''এই মনস্তাত্ত্বিক তাপ উৎপাদনের যে প্রণালী আপনি বললেন এর অভিজ্ঞতা আপনার কিরকম হয়েছিল?''

''বলছি খোকাবাবু।'' মৃদু হেসে বললেন লামা, ''এবার সেই তাপ উৎপাদনের প্রক্রিয়াতেই আসছি। এই অভিজ্ঞতা হয় দুরকমের — সাধারণ এবং অসাধারণ। তুমি তো জানো — এই যে আমরা শ্বাস নিই, এই শ্বাস যতক্ষণ ধরে রাখতে পারি সেটিই হল কুম্ভক। এইভাবে শ্বাস কুম্ভক করে প্রাণশক্তিকে ধরে রাখার ফলে মনস্তাত্ত্বিক তাপের তরঙ্গ আরো শক্তিশালী হয়। এই তাপের উদ্রেক ঘটে মূলতঃ মন এবং প্রাণশক্তি স্থির হওয়ার ফলে। তখন মুখ্য নাড়িগুলির যে রন্ধ্রপথ রয়েছে তা খুলে যায় আর তারই ফলে অমৃতরস বা চন্দ্ররসের ক্ষরণ হয় যা নাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নাড়িগুলি শ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন যোগী অনুভব করেন যে তিনি যেন দেহ ছেড়ে রেখে মহাশূন্যে উর্দ্ধলোকে বিচরণ করছেন ; সেইসময়ে তাঁর নানারকম মৃত্যু-পরবর্ত্তী সময়ের অভিজ্ঞতা হয়। তিনি প্রেতলোকে গেলে যন্ত্রণা বোধ করেন প্রেতদের মত। আবার দেবতাদের লোকে গেলে তাদের মত আনন্দ অনুভব করেন। প্রজনক রসের রূপান্তর ঘটিয়ে দেহে মূল উর্য্যাশক্তিকে জাগিয়ে তুললেই এমন অভিজ্ঞতা হয়। তারপর এই শ্রান্ত নাড়িগুলি আবার সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে দেহের বীর্য্য এবং আত্মিক শক্তির মাধ্যমে যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং

যোগী আরো অপার্থিব আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। আর ভিতরে যখন এই আনন্দের উদ্রেক ঘটে একমাত্র তখনই যোগী বাইরের প্রকৃতির সবকিছুই দেখেন আনন্দের দৃষ্টিতে। তখনই মনে চিন্তা-দুশ্চিন্তার বিষাক্ত প্রক্রিয়া বন্ধ হয় এবং মন পৌঁছয় সমাধির স্তরে। এই সমাধির স্তরে নানা অদ্ভুত জ্যোতিও দর্শন হয়।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে এই সাধনা তো সম্পূর্ণই মনোময়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।"

লামা বললেন, "ঠিক তাই। সাধনায় মনের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই আসল আর মায়ার ভেদ বোঝা যায়। যখন নিজের মধ্যে মনোলয় করে দেয়া যায় তখনই আসে যথার্থ শান্তি। আর তাই মনকে জয় করা একান্তই প্রয়োজন। যার কল্পনাশক্তি যত ভাল তার ধ্যান তত নিবিড় হয় আর ধ্যান যত নিবিড় হয় ততই এই তত্ত্বগুলি যথাযথভাবে আত্মস্থ করা যায়। এতক্ষণ যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম এই প্রক্রিয়ায় দেহের সুপ্ত জীবনীশক্তি জেগে ওঠে। আর তা সম্ভব হয় মূলতঃ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ধরে রাখা বীর্য্যকে মনঃস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে চন্দ্ররস বা অমৃতরসে রূপান্তরিত করার ফলে। এতে যোগীর শরীর থেকে রোগ, জরা দূর হয়ে যায় এবং নানা অপার্থিব অঘটনের সম্মুখীন হন যোগী।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এই অপার্থিব অঘটনের অভিজ্ঞতা কিরকম হয়?"

লামা বললেন, "এই অভিজ্ঞতা মূলতঃ হয় পাঁচ রকমের — অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নানা ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যোগী অন্যের মন পড়ে নিতে পারেন এবং নিজের ও অন্যের কোথায় ঘাটতি রয়েছে তাও বুঝে যান। আসলে আমাদের জীবনীশক্তি ছড়িয়ে থাকে রোমা সা ও কেয়াংমা সা, অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়িতে। এই দুদিকের নাড়ি থেকে প্রাণকে কুম্ভকের মাধ্যমে উমা সা বা সুষুম্না নাড়িতে এনে ঐক্যবদ্ধ করে দেহের সঞ্চিত বীর্য্যকে সাধনার মাধ্যমে রূপান্তরিত করে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বা উর্য্যাশক্তিতে জাগ্রত করতে হয়। যখনই যোগীর উর্য্যাশক্তি যোনিদেশ থেকে সুষুম্না নাড়িতে প্রবেশ করে তখনই তাঁর উর্য্যাশক্তি মেরুদণ্ড দিয়ে নাভিপদ্মে জেগে ওঠে আর তারপর সেই শক্তি মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্রের মধ্য দিয়ে অগ্নিময় রূপে উঠতে থাকে উপরপানে এবং সব স্নায়ুকেন্দ্রগুলি জাগিয়ে দেয়। তখন পাঁচটি অপার্থিব প্রতীক দেখা দেয় — পীতবর্ণ অগ্নি, শুভ্রবর্ণ চন্দ্র, রক্তিমবর্ণ সূর্য্য, নীলবর্ণ শনি এবং

গোলাপীবর্ণ বিদ্যুৎ। এই রঙের দ্যুতি যোগীর আত্মিক উন্নতির বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করে। এই যে বিদ্যুতের রং এটি হল বীর্যরসের ধারার শক্তিতে রূপান্তরের প্রতীক আর বাকি চারটি রং মূলতঃ চারটি চক্রকে নির্দেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় যোগীর মধ্যে জাগে অষ্টসিদ্ধি। এসময়েই যোগীর নানা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ঘটে।"

তারপর একটু থেমে লামা বললেন, "এবার আমরা আসব তুম্মো সাধনার মৌলিক প্রণালীর শেষ ভাগ তুরীয় শক্তির প্রসঙ্গে।

প্রাণশক্তির পাঁচটি উপাদান মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রকট হয় রোমা সা ও কেয়াংমা সা — অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়ির মাধ্যমে। এই দুই ভাবই এসে মিলে যায় উমা সা বা সুষুম্নাতে। আর তখনই যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে এবং এক অপার্থিব আনন্দে ভরে ওঠে মন।

এই প্রসঙ্গে বলি — আমাদের দেহের মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্রের নিজস্ব কর্মধারা আছে। এমনিতে আমাদের নাভিচক্রের কর্মধারার জন্য কর্ম অনুযায়ী ফল মেলে, অনাহত চক্রের কর্মধারার জন্য কর্মের ফল পরিণতি পায়, বিশুদ্ধ চক্রের কর্মধারা বাড়িয়ে দেয় কর্মের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং আজ্ঞা চক্রের কর্মধারা জীবকে সকল কর্মের ফল থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের দেহের চন্দ্ররস যখন নাড়িপথে উপরপানে যায় চক্রগুলির মধ্য দিয়ে তখনই সকল চক্রের কর্মধারা ফল দিতে থাকে এবং সমস্ত সুষুম্না নাড়ি জুড়ে দেখা দেয় অপার্থিব অনুরণন। তাতে সহস্রার চক্র যেন স্ফীত হয়ে ওঠে আর সেই স্ফীত ক্ষেত্র যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বীর্য্যের পরিবর্তিত রসে তখন সাধক লাভ করেন তুরীয় আনন্দ — আমাদের সাংগ্রীলায় যাকে বলে বজ্রধারার সাধন স্তর। এই সময়ে মূলাধার থেকে সাদা রঙের রস জেগে উঠে যায় সহস্রার অবধি এবং সহস্রারকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তাতে সহস্রারে যে লালচে রঙের রসের উদগম হয় তা নেমে এসে সমস্ত দেহটিকে ভরিয়ে দেয়। এরই ফলে অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায় মন।"

—"তাহলে এই হল তুম্মো সাধনার ফসল?"

—"ঠিক তাই। আর সেজন্যই প্রয়োজন এই তুম্মো সাধনার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখে রাখা। এর দুটো ভাগ আছে — ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে তাপের আরাম লাভ এবং ধ্যানের মাধ্যমে শরীরে আনন্দের অনুভূতি লাভ।

প্রথমে শরীরে তাপ সৃষ্টির ব্যবহারিক প্রণালীর কথাই বলি। এই প্রক্রিয়ায়

প্রথমে পদ্মাসনে বসে দুই হাত দিয়ে গোড়ালী ধরে আমাদের পেটটিকে ঘোরাতে হয় ডানদিক থেকে বাঁদিকে তিনবার এবং তারপর বাঁদিক থেকে ডানদিকে তিনবার। তারপর পেটটিকে যত জোরে সম্ভব আন্দোলিত করতে হয় মন্থনের মত। তারপর দেহটিকে ঝাঁকাতে হয় বারবার। একইসাথে বসে বসেই লাফিয়ে শরীরটিকে শূন্যে তোলার চেষ্টা করতে হয়। বার তিনেক এরকম করার পর ফুসফুসের নীচ থেকে শ্বাস ছেড়ে দিয়ে তার নীচের মধ্যচ্ছদাকে সংকোচন করতে হয়। এভাবেই ব্যবহারিক প্রণালীতে শরীরে তাপ সৃষ্টি করা যায়।''

আমি জিজ্ঞাসা করি, ''আর ধ্যানের মাধ্যমে কিভাবে তাপের অনুভূতি লাভ সম্ভব?''

লামা হাসলেন, ''সেটিও বলছি। যদি ধ্যানের মাধ্যমে দেহে উত্তাপ সৃষ্টি করতে হয় তবে বজ্রধারার অন্তঃসারশূন্য রূপ হিসেবে নিজেকে ভাবতে হয় আর নিজের মধ্যে তিনটি মূল নাড়ি, নাভিপদ্ম থেকে আজ্ঞা চক্র এবং নাভিপদ্মের নীচের সেই ত্রিকোণ স্থানটিকে কল্পনা করতে হয়। এই অবস্থায় নিজের দুই হাতের তালুতে এবং দুই পায়ের পাতার নীচে একটি করে সূর্য্যও কল্পনা করতে হয় এবং তারপর এই দুই সূর্য্য একইসাথে মুখোমুখি হয়ে দুই হাতের তালু ও দুই পায়ের পাতায় মিলিয়ে যাচ্ছে — এরকম ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের পরবর্তী স্তরে শ্বাস নিয়ে মণিপুর চক্রে বা নাভিপদ্মে, স্বাধিষ্ঠান চক্রে এবং মূলাধার চক্রে একটি করে সূর্য্য কল্পনা করতে হয়। এরপর হাতের মধ্যে আবদ্ধ সূর্য্য এবং পায়ের মধ্যে আবদ্ধ সূর্য্যকে হাত ও পা দিয়ে ঘষতে হয় আর অনুভব করতে হয় — ভিতরে আগুন জ্বলে উঠছে। এই আগুন প্রথম স্পর্শ করে নাভির নীচের সূর্য্যটিকে। সেখান থেকে অগ্নিশিখা উঠে নাভির উপরের ত্রিকোণমণ্ডল ছুঁয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। আর যেই যোগীর শ্বাস বেরিয়ে যায় তখন তাঁকে ধ্যান করতে হয় — সারা জগৎ সত্যিই হয়ে উঠেছে অগ্নিময়। এইরকম মনের চোখে দেখতে দেখতে ২১ বার বসে বসেই লাফানোর চেষ্টা করতে হয়। গুরুজী আমাকে এভাবে একটানা সাতদিন ধ্যান করিয়ে আমার শরীর থেকে শীতকে চিরতরে দূর করে দিয়েছিলেন।''

—''একটু আগে ব্যবহারিক প্রণালীর যে ভাগের কথা বলছিলেন — অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে আনন্দলাভ সেটিও কি এই ধ্যানের মাধ্যমেই লাভ হয়েছিল?''

—''না না। সেটি আরেকরকম ধ্যান। ওতে প্রথমেই মনের চোখে আমায় এক

সুন্দরী যোগিনীর রূপ কল্পনা করতে হয়েছিল। এই কল্পনার কারণ — নিজের বীর্য্যরসকে উত্তেজিত করে কাম জাগিয়ে তোলা। এরপর কল্পনা করতে হত — সেই কামের অগ্নিশিখায় ক্রমশঃ সহস্রারের হং বীজ গলছে এবং তা বিন্দু বিন্দু করে নীচে পড়ছে। একইসাথে ধ্যান করতে হত — মূলাধার থেকে জেগে ওঠা কামের আগুনের শিখা এসে পৌঁছচ্ছে নাভিতে মণিপুর চক্রে। সেইসাথে উপর থেকে হং বীজ গলে পড়তে থাকায় এই অগ্নিশিখা ক্রমশঃ অনাহত চক্র পেরিয়ে বিশুদ্ধ চক্র হয়ে আজ্ঞা চক্রে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। অতঃপর কল্পনা করতে হত — হং বীজ সম্পূর্ণভাবে গলে গিয়ে বিশুদ্ধ চক্রে নেমে আসছে আগুনের প্রবাহের সাথে এবং অমৃতস্পর্শে ভরিয়ে দিচ্ছে কণ্ঠ। এইসময়ে এক অদ্ভুত স্থূল আনন্দ অনুভব হয় দেহে। আর সেইসাথে নানারকম বিপরীতধর্মী ভাব জাগে মনে — যন্ত্রণার সাথে জাগে আনন্দ, রাগের সাথে অনুরাগ, ব্যাকুলতার সাথে নিশ্চলতা। সব বিপরীত আবেগই তখন মিলে যায় এক সুরে। এই নিশ্চলতার স্থিতিতে মন তখন বিরাজ করে।

এরপর যখন এই গলে যাওয়া হং বীজ সেই চেতন অগ্নিশিখার প্রবাহের সঙ্গে পৌঁছয় হৃদয়ের অনাহত চক্রে তখন যোগী অনুভব করেন অতীন্দ্রিয় সুখ। চারপাশের শূন্যতা তখন জেগে ওঠে নিজের ভিতরে। এরপর সেই গলে যাওয়া হং বীজের সাথে আগুনের প্রবাহ যখন এসে পড়ে মণিপুর চক্রে তখন সারা দেহ জুড়ে জাগে এক অপার্থিব অনুরণন এবং মন উপলব্ধি করে নিজের স্থূল অবয়বের সম্পূর্ণ শূন্যগর্ভতা। অবশেষে যখন সেই প্রবাহ মূলাধারে এসে পড়ে তখন যোগী দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন সর্বতোভাবে। তখনই তাঁর লাভ হয় সম্পূর্ণ আনন্দের আস্বাদ।''

এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ''এই হল তুম্মো সাধনা। এই পদ্ধতিগুলি সেদিন পরপর দেখিয়ে দিয়ে গুরুজী বলেছিলেন, 'আগামী দশ বছর মনোযোগ দিয়ে এই সাধনা করে যাবি দিনরাত। যখন এতে সিদ্ধিলাভ হবে তখন নেয়া হবে কঠোর পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষায় সফল হলে মিলবে দ্বিতীয় পাঠ — মায়াময় দেহের তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের সাধনা।'

অতএব সেই থেকে দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলেছিল আমার এই তুম্মো সাধনা। অবশেষে এতে পেলাম সিদ্ধি। গুরুজী নিজে তখন শীতের রাতে এক তুষারাবৃত

হ্রদের গর্ভে আমাকে নিরাবরণ দেহে বসিয়ে পরীক্ষা নিলেন। সেই পরীক্ষায় আমরা সাংগ্রীলা মঠের যেসব শিক্ষার্থীরা সামিল হয়েছিলাম তাদের মধ্যে আমিই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গায়ে সবচেয়ে বেশী ৫১টি চাদর শুকিয়ে নিয়েছিলাম। গুরুজী এজন্য আমাকে খুব বাহবা দিয়েছিলেন। সেই থেকে গভীর শীতেও আমার বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। শুধু লোকালয়ে আসার জন্য গায়ে পোষাক জড়িয়ে নিই।'' এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''তারপর? তিব্বতীয় যোগসাধনার পরবর্ত্তী পূর্য্যায়ে আপনার উত্তরণ হল?''

লামা মাথা নাড়লেন, ''হ্যাঁ। আসলে তিব্বতীয় যোগসাধনায় তুম্মো সাধনাই হল ভিত্তিপ্রস্তর। সেটিতে সিদ্ধ হলে বাকি সাধনে সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না।''

আমি বললাম, ''তাহলে পরবর্ত্তী সাধন প্রণালীর কথাও বলুন। আমার যে বড় জানতে ইচ্ছা — কিভাবে আপনারা রহস্যময় সাধনপ্রণালীর মাধ্যমে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জয় করেন?''

লামা মৃদু হেসে চাইলেন আমার দিকে। তারপর বলতে শুরু করলেন সাংগ্রীলার সেই নিগুঢ় সাধনতত্ত্বের পরবর্ত্তী অধ্যায়ের কথা।

সাত

লামা বলতে শুরু করলেন, ''সাধারণ মানুষ থেকে বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠার সাধনার দ্বিতীয় স্তরের সাধন প্রণালীকে বলা হয় গিউ লু বা মায়াবাদের তত্ত্ব। এই সাধনের তিনটি ভাগ আছে — ১) অশুদ্ধ প্রপঞ্চময় দেহটিকে মায়া বলে উপলব্ধি। ২) শুদ্ধ প্রপঞ্চময় দেহটিকে মায়া বলে উপলব্ধি। ৩) সবকিছুই মায়া বলে উপলব্ধি।

প্রথম ভাগের সাধনায় একটি বড় আয়না নিয়ে রাখতে হয় নিজের সামনে। তারপর যশখ্যাতি পেলে যে সুখ আমাদের মধ্যে জাগে এবং কেউ বঞ্চনা করলে বা অপমান করলে যে দুঃখ আমাদের মধ্যে জাগে সেই ভাব মুখে ফুটিয়ে আয়নায় দেখতে হয়। এতে হয় কি, অন্য মানুষরা আমাদের যেভাবে দেখছে সেভাবেই আমরা নিজেদের দেখতে পাই আর সেইসাথে অনুভব করতে পারি আমাদের

অহংসত্ত্বার হীনভাব। বুঝতে পারি — কোন অন্তঃসারশূন্য ভাবের উপর আমরা নিজেদের দেখি। এর ফলে আমরা নিজেরাই নিজেদের অহংসত্ত্বার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও মিথ্যা গর্বের প্রতি বিরক্ত হই। আর এটাই আমাদের চিনতে শেখায় — যে দেহ আর সত্ত্বাকে আমরা অবলম্বন করে থাকি তা শুধুই মায়ার প্রভাব মাত্র।

দ্বিতীয় ভাগের সাধনায় বজ্রসত্ত্ব বা অন্য কোন দেবতার ছবি এঁকে তা রাখতে হয় আয়নার সামনে। সাধনার সময়ে আমাদের ধ্যানে বসে আয়নার দিকে চোখ রেখে সেই ছবির প্রতিফলন লক্ষ্য করতে হয় এবং তাতে মনোসংযোগ করতে হয়। এতে ধীরে ধীরে ছবিটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখন পুরো সংযোগ তৈরী হয় আয়নায় দেখা ছবি ও নিজের মধ্যে। এইসময়ে নিজের দেহটিকে ভাবতে হয় আয়নায় প্রতিফলিত দেবতার দেহরূপে। এমনকি আশেপাশে অন্য কোন দেহ দেখলে তাকেও আয়নায় দেখা দেবতার রূপেরই প্রতিরূপ বলে ভাবতে হয়। ফলে চারপাশে যাই চোখে পড়ে তাই মনে হয় দেবতার অংশবিশেষ। অর্থাৎ, মন উপলব্ধি করে — দেবতারই বহুসংখ্যক রূপ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। একেই বলে অলীক দৃশ্য দর্শন — সকল স্থূল বস্তু বা প্রাণীদেহের দেবতার রূপে রূপান্তর। এই ভাগের সাধনায় একটু বেশী মনোসংযোগ লাগে। এই মনোসংযোগ আনার জন্য এসময়ে মনকে অতীতের কোন ভাবনা ভাবতে দিতে নেই। ভবিষ্যতের পূর্বানুমানের প্রচেষ্টা করতে দিতে নেই। এমনকি, বর্তমানের কোন চিন্তাও মনে রাখতে নেই। এইভাবে আয়নায় দেখা দেবতার রূপটির সাথে একাত্ম হয়ে গেলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে হয় আকাশের মহাশূন্যের পানে। এতে দেহের মূল শক্তি প্রাণশক্তির সাথে সুষুম্নায় প্রবেশ করে এবং চিন্তাধারার মধ্যে আনে স্থিরতা ও শান্তি। এই সময়ে যেমন আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখা যায় তেমনই নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় বুদ্ধদেবের নির্মাণ কায়ারও দর্শন মেলে। তারপর আবির্ভূত হয় সম্ভোগ কায়া — বুদ্ধদেবের অদৃশ্য, অপ্রাকৃত, দেহ যা শব্দরূপে ধরা দেয় কানে। তখনই উপলব্ধি হয় যে এই শব্দব্রহ্মস্বরূপ বুদ্ধই সত্য। আর সবই মায়ারূপ মাত্র।

তৃতীয় ভাগের সাধনা অন্তরে জাগায় উপলব্ধি যে সবই মায়ার রূপ। এই ভাবের সাধনা একটু গভীর। গভীর সাধনার মাধ্যমে একসময়ে মনের ভিতরে জাগে সমাধির অগাধ প্রশান্তি। চারপাশের অপার শূন্যতার অনুভূতি মনে জাগে ও সব স্থূল বস্তুই একরকম অসাড় মনে হয়। তখন যে সংসার ও নির্বাণ আমরা আলাদাভাবে দেখি

তাও যেন এক অদ্বৈত জ্ঞানে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ফলে স্থূলজগতের যেসব কিছু পূর্বে সত্য মনে হত এবার বোঝা যায় যে সবই মায়া। ধ্যানে এই অনুভূতিই মনে যোগায় শান্তি। ফলে অন্তরে যে জ্ঞানের প্রকাশ জাগে তাতে জীবনের মূল সত্য উপলব্ধি হয়। এটিই আমাদের চোখে ধরিয়ে দেয় মায়াময় জগতের আসল অসাড় রূপ। এই স্তরের সাধনার জন্য আমার লেগেছিল প্রায় চার বছর।"

আমি বলি, "এরপর কি আপনি তৃতীয় স্তরের সাধনায় মনোসংযোগ করেন?"

লামা বলেন, "ঠিক তাই। সেই স্তরটির নাম হল মি-লাম — স্বপ্নাবস্থার স্তর। এই সাধনস্তরে চারটি ভাগ আছে — স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন করা, স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতিকে পরিবর্তন করা, স্বপ্নাবস্থাও যে মায়া তা উপলব্ধি করা এবং স্বপ্নাবস্থার তত্ত্বের উপর ধ্যান করা।

প্রথমে বলি স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে। স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি বোঝা যায় স্থিরসংকল্পের মাধ্যমে, শ্বাসের মাধ্যমে এবং কল্পনার মাধ্যমে।

স্থিরসংকল্পের মাধ্যমে স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি বোঝার উপায় হল — সারাদিন জাগরণের সময়ে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হয় যে চারপাশে যা দেখা যাচ্ছে সবই স্বপ্নময় এবং মনকে একাগ্র করতে হয় এর মূল প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্য। তারপর রাতে শুতে যাওয়ার সময়ে গুরুর কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে স্বপ্নাবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। সেইসাথে এই প্রসঙ্গে গুরুকৃপার উপরেও দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হয়। এভাবে ধ্যান করলে অবশ্যই আসে সাফল্য।

শ্বাসের মাধ্যমে স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি বোঝার উপায় হল — ঘুমোনোর সময়ে শুতে হবে ডানপাশ ফিরে। শোয়ার পর ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও অনামিকা দিয়ে কণ্ঠের ধমনীতে চাপ দিতে হবে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে নাসারন্ধ্র বন্ধ করতে হবে এবং গলায় জিভের অগ্রভাগ ঠেকিয়ে রাখতে হবে খেচরী মুদ্রা সহকারে। এর ফলে স্বপ্নাবস্থাতেও চেতনা অক্ষুন্ন থাকবে এবং জাগরণ থেকে স্বপ্নের জগতে যাওয়ার সময়ে স্মৃতিশক্তির ধারাবাহিকতাও ঠিকই থাকবে। এর ফলে বোঝা যাবে যে স্বপ্নাবস্থা আর জাগরণের অবস্থা অনেকটা একইরকম এবং দুটিই সম্পূর্ণভাবে বাহ্য ব্যাপার সংক্রান্ত এবং ভ্রমাত্মক।

কল্পনার মাধ্যমে স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি বোঝারও তিনটি উপায় আছে। প্রথমটিতে নিজেকে বজ্রযোগিনী রূপে কল্পনা করে নিজের কণ্ঠের বিশুদ্ধ চক্রে লাল রঙের

জ্যোতিসম্পন্ন 'আহ' শব্দটির চিন্তন করতে হয়। মনে করতে হয় এটি যেন দিব্য বাণীর বাস্তব রূপ। তারপর মানসিকভাবে এই অক্ষরটিতে মনোসংযোগ করে যোগীকে ভাবতে হয় যে যা যা চারপাশে দেখা যাচ্ছে সে সব বাহ্যবস্তুই মিথ্যা এবং ক্ষণিকের রূপ। এসময়ে প্রতিটি স্থূল বস্তুকেই দেখতে হয় আয়নায় প্রতিফলনের মতই মায়াময় রূপে। তাতেই বোঝা যায় যে এগুলো যদিও দেখতে সত্যি তবে এর কোন আসল অস্তিত্ব নেই।

কল্পনার মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়ার দ্বিতীয় উপায় হল — উপরোক্ত প্রথাটি রাতে করার পর সকালে ২১ বার প্রাণায়াম করা — পূরক, কুম্ভক ও রেচক সহযোগে। অবশ্যই সেটা যার যতখানি সহ্য হবে। তারপর ভ্রূমধ্যে সাদা একটি বিন্দুতে মনোসংযোগ করতে হয়। এই সাদা বিন্দুটি মূলতঃ হল দেবী বজ্রযোগিনীর তৃতীয় নয়ন। এই বিন্দুধ্যান মূলতঃ করা হয় মনোসংযোগের শক্তি বাড়ানোর জন্য।

পরবর্তী ভাগ হল স্বপ্নদোষ কাটানো। অনেক সময়ে স্বপ্নে কিছু দেখার পরই মনে হয় যে এটার স্বরূপ বোঝা উচিত এবং তখনই আমরা অসময়ে জেগে উঠি। ফলে স্বপ্নের প্রকৃতি বোঝা যায় না। এটা কাটানোর জন্য পুষ্টিকর খাবার খেতে হয় এবং দৈহিক কাজ করতে হয় ক্লান্তি না আসা অবধি। এতে ঘুম ভাল হয় এবং এই স্বপ্নদোষ কেটে যায়। আবার অনেক সময়ে ক্লান্তির জন্য একই স্বপ্ন বারবার ফিরে আসে। সেক্ষেত্রে তখনই সেই স্বপ্নের উপর ধ্যান করতে হয় আর বিশ্বাস রাখতে হয় যে এর আসল প্রকৃতি অবশ্যই বোঝা যাবে। সেইজন্যই এইসময়ে পূরক কুম্ভক রেচকের মাধ্যমে বিন্দুধ্যানও খুব কাজে দেয়।

অনেক সময়ে দৈহিক কষ্ট এবং মানসিক শোকের জন্য একজন অনেক স্বপ্ন দেখে। কিন্তু জেগে উঠে কিছুই মনে রাখতে পারে না। এদের যাতায়াতের সময়ে অশুদ্ধ জায়গা (যেখানে নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে) এড়িয়ে যাওয়া উচিত, ধ্যানের মাধ্যমে সমাধিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করা উচিত এবং বিন্দুধ্যান করা উচিত মূলাধারে। এতে এই দোষ কেটে যায়।

মন নেতিবাদী শক্তিতে ভরে উঠলেও স্বপ্নদোষ আসে। এক্ষেত্রেও পূরক কুম্ভক রেচক করে মূলাধারে বিন্দুধ্যান এবং ডাকিনীদের উপাসনা করতে হয়। আসলে যোগী যখন সিদ্ধির দিকে এগোয় তখন অনেক প্রাকৃতিক শক্তি তাকে বাধা দিতে আসে। তাই প্রথমে যোগীর প্রয়োজন তাদের প্রসন্ন করা। এক্ষেত্রেও স্বপ্নদোষ কাটানোর

জন্য এই উপায়ই অবলম্বন করা হয়।"

আমি বলি, "এতো গেল স্বপ্নাবস্থার প্রকৃতি বোঝার উপায়। কিন্তু এই স্বপ্নাবস্থার রূপান্তর কিভাবে সম্ভব?"

—"ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে। ধরা যাক — আগুনের দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি। তখন নিজেকে বোঝাব — স্বপ্নে যে আগুনের উদ্ভব তা আমার কি ক্ষতি করতে পারে? সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারে না। এই ভাবনা মনে নিয়ে স্বপ্নে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাব। এভাবেই দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি হয়ে তাকে জয় করতে হয়। আর স্বপ্নাবস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর হয় যখন মন থেকে দুঃস্বপ্ন ছেঁটে ফেলে নিজের চিন্তাধারাকে বিভিন্ন স্বর্গীয় দৃশ্যের দিকে চালনা করা যায়। সেজন্য শুতে যাবার সময়ে নিজের বিশুদ্ধ চক্রে একটি লাল বিন্দুর ধ্যান করতে হয় এবং মনে বিশ্বাস জাগাতে হয় যে এরপর আমি স্বপ্নে এইরকম স্বর্গীয় দৃশ্য দেখব। এভাবে মনোসংযোগ করে যোগী স্বপ্নে যে কোন বুদ্ধলোক দর্শন করতে পারেন। এভাবে অনুশীলন করেই তো আমরা নিজেদের বোঝাতে সক্ষম হই যে সংসারে যা দৃশ্যমান, এমনকি যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ সবই আমাদের স্থূল দেহের মতই মায়ার প্রকাশ। এই উপলব্ধি জাগলেই আমরা অগ্রসর হতে পারি কামনাহীন অবস্থায় নির্বাণের লক্ষ্যে।

তাই স্বপ্নাবস্থা এবং স্বপ্নের বিষয়বস্তু যে মায়া এটাই তৃতীয় স্তরে আমাদের সাধনার মাধ্যমে স্বপ্নাবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। এজন্য প্রথমে ভয়কে জয় করা চাই। কিরকম ভাবে জানো? ধর, যদি আমার আগুনের স্বপ্ন আসে আমায় স্বপ্নে আগুনকে জলে পরিণত করতে হবে। যদি কোন ছোট বস্তুর স্বপ্ন আমায় বিব্রত করে তবে তাকে স্বপ্নে বিরাট বস্তুতে পরিবর্তিত করতে হবে। আবার যদি কোন দৈত্যের স্বপ্ন আসে তাকে বামনে রূপান্তরিত করতে হবে। এভাবে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে স্বপ্নের রূপান্তর ঘটাতে পারলে মন অনুভব করবে — যেকোন বস্তু বা রূপ বা তার আয়তন সবই মনের ইচ্ছাসাপেক্ষ এবং যেকোন স্বপ্নের অবস্থা নিজের ইচ্ছামত বদলানো সম্ভব। যেহেতু স্বপ্ন মনেরই অবচেতন স্তরের কল্পনার প্রকাশ তাই এটিও মরীচিকারই নামান্তর। শুধু তাই নয় — জাগ্রত অবস্থায় আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যে নাম বা রূপ দেখি সেগুলিও একইরকম মিথ্যা। সংসারে সবকিছুই এই মায়ার প্রকাশ। এই মায়াকে অতিক্রম করার জন্যই স্বপ্নতত্ত্বের চতুর্থ স্তরে স্বপ্নাবস্থার মূল সত্য সম্বন্ধে ধ্যান করতে হয়।"

—"সেটা কিভাবে সম্ভব?"

—"এতে প্রথমে মনকে চিন্তাশূন্য ও শান্ত করে নিতে হয়। তারপর স্বপ্নে যেসব দেবতাদের রূপ দেখা যায় তার উপর মনোসংযোগ করতে হয়। ধীরে ধীরে সব বিভিন্ন রূপ মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দিতে হয় মনের চিন্তাহীন অবস্থায়। তখন আর মায়ার কোন প্রভাব থাকে না মনের উপর। অন্তরজগৎ জেগে উঠে দর্শন করে মনের মহাশূন্যে এক দিব্যজ্যোতি। এই অবস্থায় পৌছলে যোগী উপলব্ধি করেন যে স্বপ্নের অবস্থা বা জাগরণের অবস্থা দুই-ই ভ্রমাত্মক এবং সবকিছুরই উদ্ভব হয়েছে সেই দিব্য জ্যোতির থেকে। তাই পরবর্তী স্তরে সেই শুদ্ধ জ্যোতির তত্ত্ব নিয়েই সাধনা করতে হয়।"

—"সেটি কিরকম?"

—"এই চতুর্থ স্তরের সাধনায় তিনরকম জ্যোতির তত্ত্ব আছে — মৌলিক শুদ্ধজ্যোতি (মনের প্রকৃত অবস্থা, অর্থাৎ শূন্যতায় পূর্ণ দিব্য অবস্থায় ধ্যানের মাধ্যমে যখন পৌছনো যায় তখন যে পরমানন্দে সমস্ত সত্ত্বা ভরে ওঠে তাকেই বলে মনের শুদ্ধ জ্যোতি) পথের শুদ্ধজ্যোতি এবং পরিণতিস্বরূপ প্রাপ্ত শুদ্ধজ্যোতি। এর মধ্যে পথের শুদ্ধজ্যোতির ধ্যানে একটি বিশেষ অনুশীলন করতে হয়। সেটি হল দিনের বেলায় শুদ্ধজ্যোতির প্রকৃতি ও পথের সুচারু মিশ্রণ। এটি হল গুপ্ততত্ত্বের মূল বিষয়। নিজের আপন সত্ত্বাকে জানার জন্য সাধনার একটি বিশিষ্ট স্তরে পৌছতে হয় তিনটি পরম জ্ঞানের মাধ্যমে সেখানে শিষ্য পৌছলে গুরু বুঝতে পারেন তার কতটা উন্নতি হল বিশুদ্ধতার লক্ষ্যে। এই তিনটি স্তরকে বলা হয় উদ্ভুত জ্যোতি (যা গুরু তিলোপার ছয়টি সূত্র মেনে চললে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ছয়টি সূত্র হল — ১) কল্পনা কোর না, ২) ভেব না, ৩) বিশ্লেষণ কোর না, ৪) ধ্যান কোর না, ৫) মনে কিছুর প্রতিফলন এনো না এবং ৬) নিজেকে রাখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায়। এই ছয়টি সূত্র মেনে ধ্যান করলে নিজের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যে ভিতরের সম্পূর্ণ শূন্যতা এবং বাইরের বিস্ময়কর প্রকৃতি আসলে দ্বৈত অবস্থা হলেও মূলতঃ অদ্বৈত — অর্থাৎ দুই-ই এক।) উৎস শুদ্ধজ্যোতি (যা দুটি চিন্তনের মধবর্ত্তী সময়ে বোঝা যায় যখন মনের ভিতরে অজানা, আদিম অবস্থার উদ্ভব হয়) এবং যুক্ত শুদ্ধজ্যোতি (যা উপরের দুটি জ্যোতিতত্ত্বকে বুঝতে পারলে উপলব্ধি করা যায়) সহজভাবে বলতে গেলে, এটি হল শুদ্ধজ্যোতির প্রকৃতি এবং অদ্বৈত অবস্থার

পথটিকে মনের মাঝে মিলিয়ে নেয়া। এসবের জন্যই প্রয়োজন গুরুর তত্ত্বাবধানে একান্ত মনোযোগ সহকারে ধ্যান অনুশীলন। তারপর এই অনুশীলন শেষে রাতের সময়ে শুদ্ধজ্যোতির সাথে নিজের পথকে একাত্ম করে নিতে হয়।''

—''কিভাবে?''

—''এটি একটি বিশেষ ধ্যানের মাধ্যমে করতে হয়। শোয়ার সময়ে পাশ ফিরে শরীরের ডানদিক যাতে নীচে থাকে এমনভাবে শুয়ে চিন্তা করতে হয় যে হৃদয়ের অনাহত চক্রে একটি চার পাঁপড়িযুক্ত পদ্মফুল ফুটে আছে। এর মধ্যে সামনের পাঁপড়ির উপর অবস্থান করছে 'আ' বর্ণ, ডানদিকের পাঁপড়ির উপর রয়েছে 'নু' বর্ণ, পিছনের পাঁপড়ির উপর রয়েছে 'তা' বর্ণ, বাঁদিকের পাঁপড়ির উপর রয়েছে 'রা' বর্ণ এবং কোরকের মধ্যে রয়েছে 'হুং' বীজ। এভাবে চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে আশপাশের সকল দৃশ্যমান বস্তু ও শ্রুতিগোচর শব্দসকল যেন নিজের মধ্যে মিশে যাচ্ছে এমন ভাবতে হয় এবং এই ভাবতে ভাবতে নিজেকেও মিলিয়ে দিতে হয় সেই চার পাঁপড়িবিশিষ্ট পদ্মের মাঝে। তারপর যখন আস্তে আস্তে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তখন ভাবতে হয় যে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু ও শব্দ যেন প্রথমে সামনের 'আ' বর্ণে, তারপর ডানদিকের 'নু' বর্ণে, তারপর পিছনের 'তা' বর্ণে, তারপর বাঁদিকের 'বা' বর্ণে এবং অবশেষে মাঝখানের কোরকের 'হুং' বীজে মিশে যাচ্ছে। তারপর ভাবতে হয় — এই সকল বর্ণ থেকে বিচ্ছুরিত আভা যেন মিলেমিশে প্রথমে একটি শিখা এবং তারপর একটি বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। এই কল্পনার বোধ ফিকে হয়ে আসার সময়ে যোগীকে চিন্তা করতে হয় যে তিনি শুদ্ধজ্যোতির মাঝে ঘুমিয়ে রয়েছেন। এভাবে চিন্তা করার ফলে যোগী জাগরণের স্তর থেকে যখন জাগ্রত চেতনাকে নিয়ে নিদ্রার স্তরে যান তখন তিনি ঘুমের মধ্যেও সচেতন থাকেন এবং যা তিনি স্বপ্নে দেখছেন তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন। এই ঘুমের সময়ে যে শুদ্ধজ্যোতি তাঁকে ঘিরে রাখে সেটিকে বলা হয় উৎস শুদ্ধজ্যোতি। আর নিজমনকে তিলোপার সূত্র অনুসারে চিন্তাশূন্য করে নির্বিকারভাবে নিজ সত্তায় শূন্যতার বোধ জাগানোর সময়ে যে শুদ্ধজ্যোতির দর্শন হয়, তাকে বলে উদ্ভুত শুদ্ধজ্যোতি। আর এই দুই তত্ত্বের মিলনে যে জ্যোতিদর্শন হয় তাকেই বলে যুক্ত শুদ্ধজ্যোতি।''

—''আর পরিণতিস্বরূপ প্রাপ্ত শুদ্ধজ্যোতির তত্ত্ব কি?''

—''এ প্রসঙ্গে বলি, আমরা বিশ্বাস করি — এই মরদেহ হল মাটির পাত্রের

মত যার মধ্যে রয়েছে চিরন্তনের আলো — চিরন্তনের চেতনাস্বরূপ সেই আলো প্রতিটি মানুষকেই আধ্যাত্মিক জগতে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। সেই আলো আমাদের দেখায় পথ। এমনিতে গুরুর প্রচেষ্টা থাকে শিষ্যের মায়িক আকর্ষণ কাটিয়ে দেওয়া। তাহলেই যে শিষ্যের বোধ জাগবে — তার এই মায়াময় দেহ আসলে সে নিজে নয় ; সে হল সেই জ্যোতির অংশ যা দীপ্যমান রয়েছে মহাশূন্যের মাঝে। ইতিপূর্বে যে উৎস শুদ্ধজ্যোতি ও উদ্ভুত শুদ্ধজ্যোতির কথা বললাম সেই জ্যোতির উপলব্ধি সম্ভব শুধুই ধ্যানের মাধ্যমে। এই উপলব্ধির অর্থই হল আধ্যাত্মিক পূর্ণতা অর্জন। যখন স্থূল দেহধারী জীব নিরাকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখন জাগে জীবনের প্রকৃত কর্মের প্রকৃত জ্ঞান আর তখনই সাধক তাঁর আসল বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ নির্বাণের আস্বাদ করতে পারেন। তখন তাঁর সত্ত্বা শুদ্ধজ্যোতির স্পর্শে জাগ্রত হয়ে ওঠে সর্বতোভাবে ; ফলে চেতনার পূর্ণ উন্মেষ ঘটে। আর তখনই সাধক অর্জন করেন অষ্টসিদ্ধি। এই হল বুদ্ধত্বের আসল স্তর যা একসময়ে মহাগুরু দোরজী চ্যাং তথা বজ্রধারা অর্জন করেছিলেন।

এই স্তরে পৌছনোর পরই গুরু তাঁর শিষ্যকে প্রস্তুত করেন পরবর্ত্তী স্তরের জন্য।"

—"সেই স্তরটি কি?"

—"সেটি হল বার্দো বা মরণোত্তর অবস্থার তত্ত্ব। মুক্তির জন্য এই তত্ত্বের জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। এই তত্ত্বেরও তিনটি ভাগ আছে — ১) বার্দোয় থাকাকালীন ধর্মকায়ার শুদ্ধজ্যোতির উপলব্ধি। ২) বার্দোয় থাকাকালীন সম্ভোগকায়ার অবস্থার উপলব্ধি। ৩) বার্দোয় থাকাকালীন নির্মাণকায়ার অবস্থার উপলব্ধি। এর মধ্যে প্রথমটি হল — সাধারণ যোগীদের জন্য মৃত্যু-পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা যা তাদের উপলব্ধি করায় জীবনের আসল সত্য। দ্বিতীয়টি বোধিসত্ত্বের আনন্দময় নির্বাণের অভিজ্ঞতা দেয় সীমিতভাবে। আর তৃতীয়টি পৃথিবীতে যোগীর পছন্দ অনুসারে পুনর্জন্মের পথ করে দেয়।

প্রথম ভাগটি সম্বন্ধে আগে বলে নিই। মৃত্যুর দিন তিনেক আগে থেকে সাধারণ মানুষের চেতনার মূল ক্রিয়া হ্রাস পেতে থাকে। ধীরে ধীরে এসে যায় একটি অচেতন অবস্থা। মৃত্যুর দিন তিনেক আগে থেকেই সবার প্রথমে দৃষ্টিশক্তি হয়ে যায় অন্তর্মুখী। তারপর সময়ের সাথে সাথে দেহের পৃথ্বীতত্ত্ব মিশে যায় জলের সাথে এবং দেহ

হারায় তার উপজীব্য। দেহের জলতত্ত্ব মিশে যায় দেহের অগ্নিতত্ত্বের সাথে এবং দেহের মুখ-নাক শুকনো হয়ে ওঠে। তারপর অগ্নিতত্ত্ব মিশে যায় আকাশতত্ত্বের সাথে ; তখন দেহ থেকে হারিয়ে যায় উত্তাপ। তারপর আকাশতত্ত্ব ডুবে যায় চেতনার মাঝে। এইসময়ে যারা জীবনে অন্যায় করেছে তারা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আর যাঁরা ভাল কাজে জীবন কাটিয়েছেন তাঁদের মরণের জগতে স্বাগত জানাতে আসেন গুরু, দেবতা ও ডাকিনীরা। অতঃপর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। এই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং চেতনার আত্মার সাথে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে মুমুর্ষু ব্যক্তি দেখতে পায় বহিরঙ্গে জ্যোৎস্নার জ্যোতি এবং অন্তরঙ্গে কুয়াশা। এরপরই ঘনিয়ে আসে মৃত্যু। তখন রাগের ৩৩টি আবেগের সমাপ্তি ঘটে আর বহিরঙ্গে দেখা দেয় সূর্য্যের কিরণ এবং অন্তরঙ্গে আগুনের দীপ্তি। এই মৃত্যুর ঝলকের পর আসে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির মুহূর্ত। তখন কামনার ৪০টি আবেগ প্রশমিত হয়। বহিরঙ্গে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার এবং অন্তরঙ্গে দেখা দেয় প্রদীপের শিখা। এই প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির স্তরের পর আসে শুদ্ধ জ্যোতির স্তর। অজ্ঞানের সাতটি আবেগ থেমে যায় চিরতরে। তখনই আত্মার সূক্ষ্মদেহ ধারণ সম্পূর্ণ হয়। বহিরঙ্গে তখন দেখা দেয় সন্ধ্যার দ্যুতি ও অন্তরঙ্গে মেঘমুক্ত নীলাকাশ। এরপর দেহত্যাগের কিছু পরে যখন আত্মা নিজের স্থূল চেতনা ফিরে পায় সে নিজেকে আবিষ্কার করে মরণোত্তর জগতে। একেই বলে বার্দো। এইসময়ে প্রথমেই আত্মা লাভ করে দৃষ্টিশক্তির পূর্ণ স্বচ্ছতা — চারপাশে জ্যোতির্ময় ভুবনের সবকিছুই তার চোখে ধরা দেয়। তারপর সেই জ্যোতিতে পথ দেখেই সে এগিয়ে চলে। এই অভিজ্ঞতা সকল যোগীরই হয়। এই সময়ে বিশেষ একটি সাধন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বিধেয়।"

—"কি সেই প্রক্রিয়া?"

—"মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন স্থূল জগতের সকল বন্ধন কেটে দিতে হয়। এমনকি মনে সামান্যতম মোহ বা ঘৃণাও রাখতে নেই। মনে কোন চিন্তার স্থান দিতে নেই। দেহের সবকিছু আবেগ যখন প্রশমিত হয়ে আসে তখন চিন্তাশূন্য হয়ে শান্ত থাকলে মনে জাগে সাধারণ স্থিরতা। এইসময়েই নিজের ভিতরে জীবাত্মার উদ্ভূত শুদ্ধজ্যোতি দেখতে পান যোগী। তারপরই ঘটে পরমাত্মাস্বরূপ উৎস শুদ্ধজ্যোতির জাগরণ। নিজের ভিতরে এই দুই শুদ্ধজ্যোতির মিশ্রণ ঘটিয়ে যোগী যতক্ষণ না মৃত্যু হয় যোগনিদ্রা বা ধ্যানে থাকেন। তারপর নিজ চেতনাকে সঙ্গে

নিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে মিশে যান পরম দিব্যজ্যোতির সাথে। এইভাবে নির্বাণ লাভ করে বুদ্ধত্বের অবস্থায় দেহরক্ষা করেন তিনি। আর যাঁরা এই অনুশীলন ঠিকমত করতে পারেন না তাঁরা 'দোরজী' সাধকের রূপে দেহত্যাগ করেন।"

—"তারপর?"

—"তারপর এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর যোগীদের জন্য আসে বার্দো অবস্থার দ্বিতীয় স্তর। অর্থাৎ নিজের সম্ভোগকায়া তথা সূক্ষ্মদেহের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধির স্তর। এই সময়ে যে সূক্ষ্মদেহ লাভ হয় তা পৃথিবীতে রেখে আসা স্থূলদেহের মতই দেখতে হয়। তাতে সকল ইন্দ্রিয়ই থাকে আর এই দেহের থাকে অবাধ গতি। এই দেহের সাথে থাকে পৃথিবীতে করে আসা কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি — তা দিয়ে নিজের দেহের ও পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রের রূপান্তরও সম্ভব হয় সূক্ষ্মদেহধারী আত্মার পক্ষে।"

—"কিন্তু যোগীরা যাঁরা নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁরা কি আবার পুনর্জন্মের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান?"

—"যাঁরা নিজের ভিতরে পরম দিব্যজ্যোতির সন্ধান পেয়ে তার মাঝে লীন হয়ে গেছেন তাঁদের আর ফিরে আসতে হয় না। কিন্তু যাঁরা সেটা পারেননি তাঁদের সূক্ষ্মদেহের মধ্যে প্রথমেই জেগে ওঠে অজ্ঞানের সাতটি বৃত্তি। তারপর জাগে মোহর ৪৩টি বৃত্তি এবং সবশেষে ক্রোধ-ঘৃণার ৩৩টি বৃত্তি। আর তারপর নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেহের নবদ্বারের যেকোন একটি দিয়ে স্থূলদেহ ছেড়ে আত্মা সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়ে দেহের বাইরে।"

—"তার দেহের মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থান কিরকম হয়?"

—"আগেই বলেছি — এই বার্দো দেহ বা সূক্ষ্মদেহ হল সম্ভোগকায়া। এর মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ই বর্তমান থাকে। এই দেহের থাকে অবাধ গতি। চিন্তাশক্তির মত দ্রুতগতিসম্পন্ন এই দেহ নিয়ে আত্মা যেখানে খুশী যেতে পারে। এই স্তরে যাঁরা একইরকম আত্মিক উন্নতি করেছেন তাঁরা পরস্পরকে দেখতে পান। এঁরা মূলতঃ স্থূল বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার ইন্দ্রিয়ভোগ নিবৃত্তি করেন। এই স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্র দেখা যায় না। এখানে আলোও নেই; অন্ধকারও নেই। আবার দুয়েরই মিশ্রণ আছে। স্থূলদেহের মৃত্যুর পর আত্মার চেতনা প্রায় সাড়ে তিন দিন মত অচেতন স্তরে থাকে। তারপরই আত্মা বুঝতে পারে — তার স্থূলদেহের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে মৃত্যু-পরবর্ত্তী জগৎটিতে চিন্তাশক্তি খুবই প্রবল থাকে। তাই মরলোকে করে

আসা সাধনার ফল এইসময়ে খুব কাজে দেয়। পৃথিবীতে দেহে থাকাকালীন আত্মা সাধনার সময়ে যা যা করণীয় জেনে এসেছে তা এই সময়ে তার মনে রাখা খুবই জরুরী। সেটি মনে করতে পারলে এই জগতেও সাধনা সম্ভব। আর এই জগতে সূক্ষ্মদেহকে সম্ভোগকায়াতে পরিণত করার জন্যও প্রয়োজন কঠোর সাধনা।"

—"কিভাবে?"

—"নিজের স্থূলদেহের যে মৃত্যু হয়েছে সেই সম্বন্ধে সচেতন থেকে আত্মাকে নিজ সূক্ষ্মদেহটি দেবদেহরূপে দেখে আপন ধীশক্তি তথা পৃথিবীতে করে আসা সাধনপন্থা অবলম্বন করে নিজেকে শুদ্ধজ্যোতির স্তরে নিয়ে যেতে হয়। তারপর এইভাবে নিজেকে উৎস শুদ্ধজ্যোতি, উদ্ভুত শুদ্ধজ্যোতি ও যুক্ত শুদ্ধজ্যোতির মধ্যে ধ্যান করে গুরুমন্ত্র সাধনের মাধ্যমে আত্মাকে 'দোরজী-চ্যাং' অবস্থা থেকে নিজের উত্তরণ ঘটাতে হয় পরম দিব্যজ্যোতির মাঝে। এটিই হল বার্দো অবস্থার দ্বিতীয় স্তর। প্রথম অবস্থায় যাঁরা দিব্যজ্যোতির মাঝে মিশে গিয়ে বোধিসত্ত্ব স্তরে নিজেদের উত্তরণ না ঘটাতে পারেন, এই অবস্থায় তাঁদের সেই স্তরে পৌছনোর শেষ সুযোগ থাকে।"

—"আর তৃতীয় স্তরটি কি?"

—"তৃতীয় স্তরটি হল নির্মাণকায়ার অবস্থা উপলব্ধির স্তর। যাঁরা দ্বিতীয় বার্দোতে শুদ্ধজ্যোতির পথ খুঁজে পায় না তারা এই সূক্ষ্মদেহে থাকাকালীন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব থেকে কিছু অপার্থিব শব্দতরঙ্গ শুনতে পায়। পৃথ্বীতত্ত্ব থেকে ভেসে আসে পাহাড় ভাঙার মত শব্দ। জলতত্ত্বের থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার মত শব্দ। অগ্নিতত্ত্ব থেকে ভেসে আসে দাবানলের শব্দ। আর বায়ুতত্ত্ব থেকে ভেসে আসে সহস্র বজ্রপাতের শব্দ। এই শব্দতরঙ্গগুলি অজ্ঞানী সূক্ষ্মদেহধারীদের ভয় পাইয়ে দেয়। ফলে এই শব্দতরঙ্গের থেকে তারা পালাতে যায়। সেই সময়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায় সাদা, লাল ও কালো রঙের তিনটি অতট। এই তিনটি অতট হল রাগ, লালসা ও মুর্খতার প্রতীক। আর সূক্ষ্মদেহধারীরা এর মধ্যে পড়লেই ঘটে তাদের পুনর্জ্জন্ম। এইসময়ে পূর্বজন্মের প্রারব্ধ অনুযায়ী নানা বিভীষিকাময় ভাবনা জাগে আত্মাদের মনে যা তাদের টেনে নিয়ে যায় পরজন্মের মাতৃগর্ভের দিকে।"

—"কোন মাতৃগর্ভে কে যাবে তা কি নিজে থেকে ঠিক করা যায়?"

—"যায় বৈকি। তবে তা একমাত্র যোগীর পক্ষেই সম্ভব। কারণ এইসময়ে

মনকে রাখতে হয় সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থায় — পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুই স্থান দিতে নেই মনে। আর এই মনোভাব একমাত্র যোগীর পক্ষেই রাখা সম্ভব। এই সময়ে যদি কোন মাতৃগর্ভ দূর থেকে দেখে ভাল লাগে তবে আকৃষ্ট হতে নেই ; যদি খারাপ লাগে তাহলেও বিরক্ত হতে নেই। বরং পৃথিবীতে করে আসা যোগাভ্যাসের শৃংখলা নিজের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে হয়। তাহলেই মন বুঝতে পারে — যেসব শব্দ সে শুনছে বা যেসব বিভীষিকা সে দেখছে সবই মায়ার মরিচীকা। তখনই অনাকাঙিক্ষত মাতৃগর্ভে প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যায়। সেইসাথে যদি তখন পৃথিবীতে করে আসা শূন্যতার সাধনের কল্পনা নিজের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনা যায় এবং মনে মৃত্যুর পূর্বের জন্মের গুরু আর ইষ্টের মূর্ত্তি জাগিয়ে তোলা যায় তাহলেও অনাকাঙিক্ষত মাতৃগর্ভ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়। সেইসময়ে মনে উচ্চবংশে বা সাধকবংশে জন্মের চিন্তা জাগিয়ে তুলতে হয়। তাহলেই কাঙিক্ষত মাতৃগর্ভ লাভ সম্ভব। আর এইজন্যই পৃথিবীতে যোগসাধনার এত মহিমা। যোগের পথেই নির্বাণ তথা পরজন্মের মাতৃগর্ভলাভের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।"

—"তাহলেই এটাই তো যোগসাধন থেকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এরপরও কি আর কিছু পাওয়ার থাকে?"

—"যাঁরা বার্দোয় ভয়ের বশে বা সাধনের ভুলে মোক্ষলাভে ব্যর্থ হন তাদের জন্য আশার আলো রূপে আছে তিব্বতীয় যোগের ষষ্ঠ স্তর ফো-ওয়া। এটি হল চেতনা স্থানান্তরণের মত। এই মতের আবার দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আবার তিনটি ভাগ আছে — ১) ধর্মকায়ায় স্থানান্তরণ ২) সম্ভোগকায়ায় স্থানান্তরণ। ৩) নির্মাণকায়ায় স্থানান্তরণ। এর মধ্যে ধর্মকায়ায় স্থানান্তরণ হল শুদ্ধজ্যোতির উপলব্ধি অন্তরে গ্রহণ। সম্ভোগকায়ায় স্থানান্তরণ হল বার্দো বা মরণ-পরবর্ত্তী স্তরে নিজের দিব্যদেহে জাগরণ আর নির্মাণকায়ায় স্থানান্তরণের মানে হল সাধক বংশে ও সাধন উপযোগী পরিবেশে পুনর্জন্ম নেয়া।

এই ফো-ওয়ার দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে গুরুধ্যানের মাধ্যমে চেতনার স্থানান্তরণ। এর ফলে পুনর্জন্ম এড়ানো ও মোক্ষলাভ সম্ভব। এই সাধনায় প্রথমে নিজেকে দেখতে হয় দেবী বজ্রযোগিনীর ছায়াদেহরূপে। কল্পনা করতে হয় — দেহের ঠিক মেরুদণ্ড বরাবর উঠে গেছে উমা সা বা সুষুম্না নাড়ি। সুষুম্নার নিম্নদেশ মূলাধার চক্রে বন্ধ রয়েছে। আর উপরের স্তর চলে গেছে আকাশ অবধি। তার উপরে দিব্য

গুরু দোরজী-চ্যাংকে কল্পনা করতে হয়। কল্পনা করতে হয় যে তাঁর দেহটিও শূন্যময় ; তবে তাঁর দেহের মেরুদণ্ডে স্থিত আছে জ্ঞানময় সুষুম্না নাড়ি। তারপর কল্পনা করতে হয় — যোগীর সুষুম্না নাড়ি সহস্রার দিয়ে বেরিয়ে শূন্যপথে গিয়ে মিশেছে এই গুরুর সুষুম্না নাড়ির সাথে। তারপর একটি নীলরঙা 'হুং' বীজ কল্পনা করতে হয় গুরুর হৃদয়ে এবং আরেকটি 'হুং' বীজ কল্পনা করতে হয় নিজের হৃদয়ে। তারপর কুম্ভক করে শ্বাস আটকে ধ্যান করতে হয় — গুরুর হৃদয়ের ভিতরে অবস্থিত 'হুং' বীজ দীর্ঘায়িত হতে হতে নীচের দিকে নামছে এবং নিজেকে ছড়িয়ে নিচ্ছে যোগীর হৃদয়ের চেতনার মূল সত্ত্বার সাথে আর যোগীর হৃদয়ে অবস্থিত 'হুং' বীজকে যেন উপরদিকে টেনে নিচ্ছে। এইসময়ে প্রতিটি শ্বাস ছাড়ার সময়ে অনেকটা সাহায্য চাওয়ার মত করে 'হীগ' শব্দটি জোরে জোরে উচ্চারণ করতে হয়। প্রতিটি চক্রে ২১ বার করে এটি উচ্চারণ করতে হয়। অতঃপর ভাবতে হয় যোগীর হৃদয়ের 'হুং' বীজ উঠে গেছে সহস্রারে। এরপর এই 'হুং' বীজকে 'কা' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আবার নামিয়ে আনতে হয় সুষুম্না নাড়ির মধ্যস্থিত অনাহত চক্রে। তারপর ২১ বার এই 'কা' শব্দটি উচ্চারণ করতে কল্পনা করতে হয় যে 'হুং' বীজ প্রতিটি চক্র ধরে ধরে নামছে মূলাধারে। এভাবে দেহের ষটচক্রে 'হুং' বীজকে নিয়ে যাওয়ার পর তা মিশিয়ে দিতে হয় গুরুর হৃদয়ের অনাহত চক্রে। আর তারপর গুরু শিষ্যকে নিয়ে সেই দিব্যলোকে চলে যান যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না পৃথিবীতে। এই হল তিব্বতীয় যোগসাধনার সর্বশেষ স্তর।"

আমি বললাম, "আপনি কি সাংগ্রীলায় সাধনার এই সব স্তরই অতিক্রম করেছেন।"

লামা হাসলেন, "আমি সাংগ্রীলায় প্রথম সব স্তরের সাধনাই করেছি। এমনকি সাধনা চলাকালীন দেহ ছেড়ে রেখে বার্দো স্তরের সাধনাও করেছি এবং সেই স্তরে ভয়ের বাধা পেরিয়ে আবার ফিরে এসেছি দেহে। অবশেষে সাংগ্রীলার সর্বোচ্চ সাধন ফো-ওয়াতেও সিদ্ধ হয়েছি। আমার গুরুজী রেচুং লামার অপার করুণায় এভাবেই লাভ করেছি যোগসিদ্ধি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিন্তু দেহ ছেড়ে রেখে বার্দো স্তরের সাধনা করলেন কিভাবে?"

লামা হাসলেন, "সেই রহস্যটাও শুনতে চাও? কোন রহস্যই যে আর তুমি

রহস্য রাখতে দেবে না দেখছি।" রহস্যের প্রসঙ্গে রহস্যময় হাসি হাসেন লামা।

আট

লামার মুখে হাসি দেখে ভরসা পাই আমি। কারণ হাসি যে সম্মতির লক্ষণ। অতএব তাঁকে অনুরোধ করলাম, "বলুন না আপনার সেই অপার্থিব অভিজ্ঞতার কথা। এতক্ষণ তো আপনার সাংগ্রীলার সাধনপ্রণালীর কথা শুনলাম। কিন্তু সেই সাধন আপনি কিভাবে আয়ত্বে আনলেন তা শুনতেও যে আগ্রহ জাগছে মনে।"

লামা আমার অনুরোধ শুনে স্মিত হাসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, "আসলে কি জানো, সাংগ্রীলার মঠে যদিও অনেক পুরুষ লামা এবং মহিলা লামাও আছেন কিন্তু আমার গুরুজী রেচুং লামা ছাড়া কারোর সাথেই আমার তেমন ভাব বিনিময় হয়নি। ওখানে সবাই নিজ নিজ কক্ষে আপন আপন সাধনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাই গুরুজী আমাকেও ওখানে সাধনায় ডুবে থাকার নির্দেশই দিয়েছিলেন। আমারও অন্য কোনদিকেই লক্ষ্য ছিল না — শুধু সাধনায় সিদ্ধি অর্জনই ছিল লক্ষ্য।

প্রাথমিক অনুশীলনের জন্য আমার লেগেছিল এক বছর। তুম্মো সাধনা সম্পন্ন করতে লেগেছিল দশ বছর। দ্বিতীয় স্তরের সাধনায় চার বছর, তৃতীয় স্তরের সাধনায় পাঁচ বছর ও চতুর্থ স্তরের সাধনার জন্য আট বছর সময় লেগেছিল। এর মধ্যে তুম্মো সাধনা মঠের ভিতরেই করেছি আমি। কিন্তু তুম্মো সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার পর যখন আপন শরীরে উত্তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা জাগল আমার মধ্যে তখন গুরুজী আমার সাধনক্ষেত্র নির্বাচন করলেন কাছের একটি পার্বত্য গুহায়। সাংগ্রীলা মঠের ঠিক পিছনে যে পবিত্র গুহা রয়েছে — যেখানে হাজার বছরের মহাত্মারাও সাধনমগ্ন থাকেন — তার থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে এরকম অনেক গুহা আছে। তারই একটিতে একদিন আমাকে নিয়ে এলেন গুরুজী। বললেন, 'এবার এখানে থেকেই তোকে সাধনা করতে হবে। গুহামুখের সামনে বোল্ডার দিয়ে দেওয়াল তুলে দিবি। আর ভিতরে বসে সাধনা করবি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাবে?'

গুরুজী বললেন, 'পাবে না। কারণ তুই তুম্মোসাধনে সিদ্ধ। তাই আপন দেহে

তাপ সৃষ্টি যেমন তোর করায়ত্ত হয়েছে তেমনই ক্ষুধা-তৃষ্ণাও জয় হয়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে সেই বোধ তোর জাগেনি যেহেতু নিয়মিত খাওয়া দাওয়া তোর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে যখন তুই ধ্যানের মাধ্যমে নিজের ভিতরে ডুব দিবি তখন আপনা থেকেই তোর ভিতর থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ দূর হয়ে যাবে। তুই তখন উপলব্ধি করবি — শরীরটা তুই নোস ; শরীরের মধ্যে তুই শুধু বসে আছিস মাত্র। ক্ষুধা-তৃষ্ণা আত্মার থাকে না ; শরীরের থাকে। সাধারণ মানুষ নিজেকে শরীরের সাথে মিলিয়ে ফেলে বলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পায়। কিন্তু সিদ্ধযোগীর এই বোধ থাকে না। বাহ্যিক জগতে অবশ্য খাদ্য-পানীয় না নিলে শরীর টেকে না। আর শরীর যেহেতু মন্দির তাই ওইসব স্থানে তপস্যা করতে হলে খাদ্য-পানীয়েরও প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সাংগ্রীলা তো চতুর্থ আয়ামের অন্তর্গত। এখানে সময়ের প্রকোপ অনেক শিথীল। তাই এখানে শরীররক্ষার জন্য খাদ্যপানীয়ের প্রয়োজন পড়ে না। অতএব তুই গুহামুখ বোল্ডার দিয়ে বন্ধ করে ভিতরে বসে সাধনা কর্। যখন তোর এই দ্বিতীয় স্তরের সাধনায় সিদ্ধি হবে আমি তো সাধনবলে জানতেই পারব। অতএব তখন আমি নিজে এসে বোল্ডার সরিয়ে গুহামুখ খুলে তোর সাথে দেখা করে যাব।'

গুরুজীর কথা আমার কাছে বেদবাক্যস্বরূপ। অতএব সেদিন তিনি বিদায় নেবার পরই আমি গুহামুখ বোল্ডার দিয়ে বন্ধ করে ধ্যানে বসে গেলাম। পদ্মাসনে ঋজুভাবে বসে ডুব দিলাম নিজের মধ্যে। দেখতে দেখতে বাইরের পৃথিবী হারিয়ে গেল গুহার বাইরে। আমি হারিয়ে গেলাম নিজের ভিতরে। তন্ময় হয়ে গেলাম নিজের মাঝে। প্রায় চার বছর এভাবে গুরুজী নির্দেশিত পন্থায় পিউ লু সাধনায় আমি ডুবেছিলাম নিজের মাঝে।

সে এক অপার্থিব অনুভূতি। ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজিজ্ঞাসা ও নিজের মাঝে নিজের প্রকৃত স্বরূপকে খোঁজার চেষ্টা করতে করতে একসময়ে মন চলে এল আপন সত্তার কেন্দ্রে। ধীরে ধীরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল আমার অহংবোধ। নিস্তরঙ্গ হয়ে এল মন। মনের সকল চিন্তাভাবনা দূর হয়ে গেল। মনের অস্তিত্বটুকুও আর অবশিষ্ট রইল না। সময়ের বোধও আর রইল না। জেগে উঠল দিব্য চৈতন্য। আর তারই সাথে পূর্ণ আনন্দের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেলাম আমি। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময়ের স্রোত বয়ে যেতে লাগল খেয়ালও রইল না।

খেয়াল হল যখন ভিতর থেকে গুরুজীর নির্দেশ পেলাম। বারবার ভিতর থেকে মনে জেগে উঠতে থাকল গুরুজীর ডাক। অনেকবার এভাবে ডাকার পর আমার চৈতন্য ফিরল বটে। কিন্তু আসন ছেড়ে উঠতে চাইছিল না মন। তবু গুরুজীর নির্দেশ তো অমান্য করা চলে না। তাই উঠলাম। নিজের হাতে বোল্ডারের স্তূপ সরিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দর্শন করলাম গুরুজীকে। তখন গুরুজীই জানালেন — আমি একাসনে চার বছর ব্যাপী সাধনার পর গিউ-লু সাধনায় সিদ্ধ হয়েছি।

এরপর তিনি আমাকে একইভাবে মি-লাম সাধনার পাঠ দিলেন। তাতেও আমায় একইভাবে সাধনা করতে হয়েছিল। পাঁচ বছর সাধনার পর তাতে সিদ্ধির পর গুরুজী আমায় দিয়েছিলেন ওড-সাল সাধনার পাঠ। তাতে আট বছর লেগেছিল। এই তিনটি স্তরের সতেরো বছরের সাধনায় আমায় কিছু খেতেও হয়নি আর পানও করতে হয়নি।

ওড সাল সাধনা হল নশ্বরদেহে সিদ্ধিলাভের মুখ্য স্তর। কারণ এরপরেরটা বার্দো স্তরের সাধনা। ওটা মৃত্যুর পরবর্তী জগতের জন্য। তবু ওড সাল স্তরের সাধনায় সিদ্ধির পর আমি গুরুজীকে ধরলাম এই বার্দো স্তরের সাধনায় ও ফো-ওয়া স্তরের সাধনায় আমাকে সিদ্ধিলাভ করানোর জন্য।

আমার অনুরোধ শুনে গুরুজী বললেন, 'জীবিত অবস্থায়ও যে বার্দো স্তরের সাধনা করা যায় না তা নয়। তবে এটা খুব কঠিন সাধনপন্থা। দেহ ছেড়ে রেখে দেহাতীত অবস্থায় বেরিয়ে নিজেকে ফো ওয়ার মাধ্যমে শুদ্ধজ্যোতির স্তরে মিলিয়ে দেয়া। আবার সে-পথে ক্রিয়াসিদ্ধির পর আবার দেহে ফিরে আসা। একটু এদিক-ওদিক হলে কিন্তু প্রাণও যেতে পারে।'

তাতেও আমি পিছপা নই। বললাম, 'প্রাণ আছে যখন তখন একদিন তো যাবেই। আপনিই তো বলেন — জন্ম হল মৃত্যুর সূচনা আর মৃত্যু হল জন্মের সমাপ্তি। রক্তমাংসে গড়া এই দেহ অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হলেও এর মধ্যে সুপ্ত রয়েছে চৈতন্যের জ্যোতি। সেই জ্যোতিতে আমি উদ্ভাসিত হয়েছি ওড-সাল সাধনার সময়েই। আর বুঝেছি — আমাদের যাবতীয় কষ্টের মূল হল অহংকার। এই অহংকারের উৎস জ্ঞান নয় — অজ্ঞান। অজ্ঞানের কারণ জীবের স্থূল অহং। এই স্থূল অহং আসে কাম ও ক্রোধ থেকে। কাম ও ক্রোধ আসে চারপাশের পরিবেশ থেকে যার মধ্যে আমাদের থাকতে হয় এবং এই পরিবেশ তৈরী করে দেয় পূর্ব

প্রারব্ধকর্ম। আর এই প্রারব্ধকর্মের কারণও হল গতজন্ম। অর্থাৎ — জন্মলাভই দুঃখের মূল কারণ। তাই জন্ম-মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করতে না পারলে দুঃখের থেকে নিষ্কৃতি মিলবে না। অতএব নির্বাণ একান্ত প্রয়োজন। আর আপনার কাছেই শুনেছি — যারা নির্বাণের লক্ষ্যে সাধনা করে তারা এই মৃন্ময় দেহেই মোক্ষের চিন্ময় সত্তার মাঝে নিজেকে লীন করে দিতে পারে। তাই আমি বার্দো স্তরের সাধনাও করব।'

—'বেশ। তাই হবে। মৃত্যুকে জানার জন্য এই সাধনার কোন বিকল্প নেই। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় অজ্ঞানের জন্য — যেহেতু মৃত্যুকে তারা জানে না। আর মারা না গেলে মৃত্যুকে জানাও সম্ভব নয় সাধারণভাবে। তবে জীবিত থাকাকালীন মৃত্যুকে জানার একমাত্র উপায় বার্দো ধ্যান। এটি হল বেঁচে থেকেও মৃত্যুকে আস্বাদ করার একমাত্র পথ। আর সত্যি বলতে কি — মৃত্যুর কথা ভাবতেই ভয় জাগে ; কিন্তু যখন মৃত্যু সত্যিই আসে সামনে তখন কোন ভয় হয় না। তখন বোঝা যায় — মৃত্যু জীবনেরই একটা স্তরবিশেষ। ঠিক যেন একটি দরজার মত। বার্দো ধ্যানে যারা পারদর্শী তারা বারবার এই দরজা অতিক্রম করে যেতে পারে ; আবার ফিরেও আসতে পারে। এই দরজা দিয়ে ভিতরে গেলে সূক্ষ্মজগতের আস্বাদ করা যায়। আর এই দরজা দিয়ে বাইরে বেরোলে স্থূল জগতের মাঝে ফিরে আসা হয়। তবু মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কারণ ভয় সবসময়ে যুক্ত থাকে ভবিষ্যতের কল্পনার সাথে। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে যে স্থির থাকে তাকে কোন ভয়ই টলাতে পারে না। তাই তোর মধ্যে যখন সেই সাহসের সঞ্চার ঘটেছে তখন আজ রাতেই তোকে বার্দো ধ্যানে মনোনিবেশ করতে বলছি। আজ রাতেই তুই আবার গুহামুখ বন্ধ করে সাধনে বোস। আমিও আমার নির্দিষ্ট আসনে বসে লক্ষ্য রাখব তোর উপর। তবে মনে রাখিস — বার্দো স্তরে অনেক বিভীষিকা তোর সামনে আসবে। কিন্তু তোর ভয় পেলে চলবে না। মাথায় রাখতে হবে — এসবই মায়া। মরীচিকা ভিন্ন কিছু নয়। আর যখনই বিপদ দেখবি তখনই আমার দেখানো পন্থায় সাধন করবি। তাহলেই দেখবি কেটে যাবে সব বাধা। নিজেকে জানলেই যে মৃত্যু জয় হয়ে যায়।' এই বলে গুরুজী আমাকে বার্দো স্তরের সাধনপন্থা বুঝিয়ে দিলেন।

যথাসময়ে রাত নামল পৃথিবীর বুকে। নির্জন সুনসান চারদিক। অন্ধকার গুহার বাইরে চলছে বাতাসের দাপট। গুহার মধ্যে নিভৃতে বসে আমি শুরু করলাম সাধন।

আমাদের কাছে সাধন মানেই চিন্তাশূন্য স্তর। যখনই সাধকের মনে জাগে চিন্তা তখনই আসে বাধা ; যখন মন চিন্তাকে অতিক্রম করে যায় তখনই তার মধ্যে জাগে ধ্যান। কারণ মন মাত্রেই আমিত্বের চিন্তামাত্র। আমিত্ব সরিয়ে দিলেই মনোলয় সম্ভব। আর আত্মার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণেই সরে যায় আমিত্ব। অতএব আমার থেকে আমিকে বাদ দিয়ে শুরুতেই মনকে চিন্তাশূন্য করে বসলাম সাধনে। ঝাঁপ দিলাম হৃদয়ের গভীরে — নিজের মাঝে ডুবে গেলাম। জীবিত অবস্থায় যাঁরা বার্দো সাধনা করেন তাঁদের দেহ থেকে সাময়িকভাবে বেরিয়ে আসার একটি গুপ্ত পন্থা আছে। সেই পন্থা অনুযায়ী শ্বাস কুম্ভক করে দেহের সকল বায়ু টেনে নিলাম হৃদয়ের অনাহত চক্রে। তারপর নিজের প্রাণ নিয়ে সূক্ষ্মদেহে বেরিয়ে পড়লাম কালের পথে। কথাটা যত সহজে বললাম ততটা সহজে যে হয়নি কাজ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এর বেশী এই বিশেষ পন্থাটি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বলেই এখানে বলতে পারলাম না।

স্থূলদেহ থেকে বেরিয়ে দেখি — আমার ওই দেহটা একইরকমভাবে ধ্যানমগ্ন। আর যে সূক্ষ্মদেহ আমি ধারণ করেছি এই সূক্ষ্মদেহটিও একদম আমার স্থূলদেহের মতই দেখতে। নিজেকে সূক্ষ্মদেহে দেখে একটা অনাস্বাদিত শান্তির স্পর্শ অনুভব করলাম মনে। আর তৎক্ষণাৎ খেয়াল করলাম — বেশ কিছু প্রেত আশেপাশে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের সূক্ষ্মদেহ খুবই অপরিচ্ছন্ন — জ্যোতি তো নেই বললেই চলে ; কেমন যেন ঘোলাটে অবয়ব। বুঝলাম — এরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রেত ; অরক্ষিত দেহ পেয়ে সেটি অধিকার করার চেষ্টা করছে। তৎক্ষণাৎ আমি গুরুজীর দেয়া মন্ত্রের মাধ্যমে আমার স্থূলদেহটি বন্ধন করে দিলাম। মন্ত্রের তেজে এক অতীন্দ্রিয় জ্যোতির বলয় জেগে উঠল আমার স্থূলদেহের চারপাশে। তৎক্ষণাৎ আশেপাশের ওই নিকৃষ্ট প্রেতগুলি ছিটকে সরে গেল সামনে থেকে। তাদের মধ্য দিয়েই আমি অগ্রসর হলাম আমার গন্তব্যপথের দিকে।

ঠিক এই সময়ে সামনে দেখলাম উপরপানে চলে গেছে দুটি পথ — একটি পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্যটি আলোয় পরিপূর্ণ। আর আমার লক্ষ্য যে আঁধার নিশা নয় — আলোর দিশা। তাই আলোর পথ ধরেই উপরপানে যেতে লাগলাম আমি। যেতে যেতেই দেখতে লাগলাম — এই পথে চারিপাশ জুড়ে এক অপার্থিব নীল আভা। দেখতে দেখতে আমার সূক্ষ্মদেহ উঠে যেতে লাগল উপরপানে। আশপাশ

দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কত দিব্য জ্যোতির্ময় আত্মা। পথের দুপাশে সূক্ষ্মে নানারকম 'লোক' দেখা যাচ্ছে। কত জ্যোতির্ময় আত্মা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশেপাশে সূক্ষ্মে কত পাহাড় পর্বত রয়েছে — সব দিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ। সেসব দেখতে দেখতেই এগিয়ে চললাম আমি সেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ পথে।

সহসাই পথের একপাশ থেকে ভেসে এল ভয়ংকর একটা শব্দ। ঠিক যেন বিরাট এক অ্যাভালাঞ্চ নামার শব্দ — সাংগ্রীলার কাছের পার্বত্য প্রদেশে যেমন নিয়ত অ্যাভালাঞ্চ ও তুষারধ্বস নামে অবিকল সেই শব্দ। সাংগ্রীলায় আসার পর প্রথম-প্রথম যখন এই অ্যাভালাঞ্চ নামত বেশ ভয় পেয়ে যেতাম। সময়ের সাথে সাথে সেই ভয় অবশ্য আমার কেটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে কিভাবে যেন সেই বিস্মৃত ভয় আবার অনুভূত হল মনে। আর তারপরই দেখতে পেলাম বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই তুষারধ্বসের সাথে নেমে আসছে আমার দিকে। অতএব তৎক্ষণাৎ আমি পালানোর চেষ্টা করলাম। পিছন ফিরে ভুলোকের দিকেই ছুটলাম। কিন্তু সেই অ্যাভালাঞ্চ আমাকে তাড়া করে আসতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে তার প্রলয়ংকর শব্দতরঙ্গ ভয়ংকর থেকে ভয়ংকরতর হয়ে উঠতে লাগল। আর আমিও বিষম ভয়ে দ্রুতবেগে নামতে লাগলাম নীচের দিকে।

দেখতে দেখতে নেমে এলাম ভুলোকের কাছে। সহসা আমার সূক্ষ্মদেহের চোখে পড়ল — কোন এক বিদেশী শহরে এসে পড়েছি। এই শহরে যে যে ঘরে মাতৃজঠর রয়েছে সেসব চোখে পড়তে লাগল। আর ভিতর থেকে মন বলতে লাগল — এর কোন একটিতে ঢুকে যেতে পারলেই এই অ্যাভালাঞ্চের হাত থেকে রক্ষা পাব। এই সময়ে সামনে একটি ফরাসী মহিলাকে দেখতে পেয়ে থমকে গেলাম। মনে হল — এই ফরাসী মহিলার জঠরে প্রবেশ করলেই রক্ষা পাব। অতএব আত্মরক্ষার জন্য সেই জঠরে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হলাম। আর ঠিক এমন সময়ে হঠাৎই সামনে দেখলাম এক অপার্থিব আলোর প্রকাশ। দেখতে দেখতে সেই আলোকবলয়ের মধ্য থেকে দীপশিখার রূপে প্রকট হলেন আমার গুরুজী রেচুং লামা।

আমি গুরুজীকে দেখেই সকাতরে বললাম, 'গুরুদেব, আমাকে ওই জঠরে প্রবেশের অনুমতি দিন। নাহলে যে ভয়ংকর অ্যাভালাঞ্চ আমাকে ঊর্দ্ধলোক থেকে ভুলোক পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে তা আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।'

আমার অবস্থা দেখে হাসলেন গুরুজী, 'কিসের অ্যাভালাঞ্চ? তুই যা শুনছিস বা দেখছিস এসবই তোর মনের বিভ্রম। স্থূলদেহে থাকাকালীন এই অ্যাভালাঞ্চে তোর ভয় ছিল। আর তাই দেহ ত্যাগের পর তোর মনের ওই সুপ্ত ভয়ই তোকে তাড়া করছে। তুই বর্তমানে যেমন সূক্ষ্মদেহে আছিস তেমনই এই ভয়ও সূক্ষ্মেই আপন রূপ ধরে তোকে আবার ঠেলে দিচ্ছে মায়ার সংসারের দিকে। এখন এই ভয়ের থেকে রক্ষা পেতে যদি ওই ফরাসী মেয়েটির জঠরে গিয়ে ঢুকতিস তাহলে তোর এই জন্মের ফেলে আসা দেহটিও যেত। সেইসাথে আরো বহু বছর মায়ার সংসারের ঘানি তোকে টানতে হত।'

এদিকে দেখছি — অ্যাভালাঞ্চের তুষারপ্রবাহ আমাদের সামনে এসে পড়েছে। এখন উপায়? আমি কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম। গুরুজী বললেন, 'দ্যাখ, আসল মৃত্যু কি জানিস? নিজের মূল স্বরূপের প্রকৃতিকে ভুলে যাওয়াই হল আসল মৃত্যু। আর তা স্মরণ করাই হল পুনর্জন্ম। এতক্ষণ তুই ছিলি মৃত — কারণ নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়েছিলি। আর এবার আমি তোকে মনে করিয়ে দিলাম তোর মূল স্বরূপের কথা। তাই এবার আসল পুনর্জন্ম হল তোর। ওরে, সামনে যে অ্যাভালাঞ্চ দেখছিস এটিও আছে তোর মতই সূক্ষ্মে। আর সূক্ষ্মেই যাই থাকুক না কেন তার মধ্যে কোন বিপর্যয় ঘটানোর শক্তি থাকে না। তাই শান্তভাবে এর সম্মুখীন হয়ে শুরু কর "হুং" বীজ জপ। দেখবি — সব কেটে যাবে।' বলতে বলতে আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন গুরুজী।

আমি এদিকে দেখছি — সেই বিশাল অ্যাভালাঞ্চ এসে আমার উপর ভেঙে পড়তে উদ্যত। কিন্তু এবার আমি আর পালানোর চেষ্টা করলাম না। শান্তভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সাধনপন্থায় মনোসংযোগ করে শুরু করলাম 'হুং' বীজ জপ। কিছুক্ষণ নীরবে জপ করে ওঠার পর দেখলাম — কোথায় অ্যাভালাঞ্চ? কিছুর চিহ্ন কোথাও নেই। সামনের পথ তো আগের মতই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। তৎক্ষণাৎ সাংগ্রীলায় সাধনার সময়ে শোনা গুরুজীর কথা মনে পড়ল। এই পথে যাই চোখের সামনে দেখছি সবই কল্পনার ফসল। সকল জ্যোতির্ময় আত্মারা তাঁদের কল্পনায় সৃষ্টি করেছেন এই আশপাশের প্রকৃতি। তাই এখানে সবই কল্পলোকের মত — এখানে কোনকিছুতেই বিচলিত হবার কিছু নেই।

অতঃপর আবার উঠতে লাগলাম উপরপানে। মন শান্ত ধীরস্থির রাখলাম।

পৃথিবীতে করে আসা যোগাভ্যাসের স্মৃতি জাগিয়ে তুললাম মনের মাঝে। তৎক্ষণাৎ মনের উচাটন ভাব কমে গেল। এভাবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলাম উপরপানে। এইসময়ে সহসাই কানে এল এক বিরাট জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। শব্দটি কানে আসামাত্র চোখের সামনে জেগে উঠল এক বিরাট মহাসাগরের দৃশ্য। সুবিশাল জলোচ্ছ্বাস উঠছে সাগরে। আর তার ঢেউ যেন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সহস্র ফণা তুলে ছুটে আসছে।

এবার কিন্তু আর পালালাম না আমি। মনের মধ্যে যোগের শান্ত অবস্থা ফিরিয়ে আনার ফলে সহজেই উপলব্ধি করলাম — আগেরবারের মত এটিও বিভ্রমের নামান্তর। যে জগতের সবকিছুই অলীক তা আমার ক্ষতি করবেই বা কিভাবে? এতে মায়াচ্ছন্ন মন ভয় পেতে পারে। কিন্তু আমি পাব কেন? অতএব তৎক্ষণাৎ সেই সূক্ষ্ম লোকেই আমি আসন গ্রহণ করলাম। আর শান্তভাবে 'হুং' বীজ জপ করতে করতে চেয়ে রইলাম সেই জলোচ্ছ্বাসের দিকে। স্পষ্ট দেখলাম — সেই জলোচ্ছ্বাস আমার উপর ভেঙে পড়ল এবং আশেপাশের সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারলাম না। ঠিক যেন মায়ার মেঘ আমাকে ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

আর তৎক্ষণাৎ আমার ভিতরে ভেসে উঠল গুরুজীর নির্দেশ, "এই তো চাই। বার্দোর বাধা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে তোর পক্ষে। এবার দেহে ফিরে এসে ফো-ওয়া সাধনা শুরু কর্। প্রথমে অন্তরে দিব্যজ্যোতির ধ্যান কর্ আর তারপর ফো-ওয়ার পন্থাগুলি মনে করে সাধনে ডুবে যা। মোক্ষ তোর থেকে আর বেশী দূরে নেই।"

গুরুজীর নির্দেশ অন্তরে পেয়ে সূক্ষ্মদেহেই আমি প্রত্যাবর্তন করলাম সেই গুহায় আমার ফেলে আসা স্থূলদেহের মাঝে। দেখতে না দেখতেই ফিরে এলাম সেই বন্ধ গুহায়। ওখানে আমার স্থূলদেহটি বন্ধন করাই ছিল। অতএব তার মধ্যে প্রবেশ করতেও অসুবিধা হল না।

তারপর শুরু করলাম আমার সাধনের শেষ স্তর। মনে মনে কল্পনা করলাম — আমার এই দেহ যেন আমাদের ইষ্টদেবী বজ্রযোগিনী তারাদেবীর ছায়াদেহ। তারপর এই দেহের মেরুদণ্ডে স্থিত সুষুম্না নাড়িতে মনোসংযোগ করলাম। তৎক্ষণাৎ চোখে ভেসে উঠল — আমার মূলাধারের উপর থেকে উঠে এই সুষুম্না নাড়ির উর্দ্ধদেশ

আমার দেহের আজ্ঞা চক্র অবধি বিস্তৃত। তারপর শুরু করলাম আকাশে দিব্যগুরু দোরজী চ্যাং-এর জ্যোতির্ময় রূপ ধ্যান। কিছুক্ষণ গভীরভাবে ধ্যান করতে করতেই স্পষ্ট দেখলাম — গুরু দোরজী চ্যাং প্রকট হলেন আকাশপারে। দেখলাম তাঁর দেহটি শূন্যময়। আর তাঁর দেহের মেরুদণ্ডে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জ্ঞানময় সুষুম্না নাড়ি। সেইসাথে দেখলাম — আমার দেহের সুষুম্না নাড়ি সহস্রার দিয়ে বেরিয়ে উঠে যেতে লাগল আকাশপানে এবং দেখতে দেখতে তা গিয়ে মিশল গুরু দোরজী চ্যাং-এর দিব্যদেহের সুষুম্না নাড়ির সাথে। আর তৎক্ষণাৎ এক দিব্য অনুরণন ঢেউ তুলতে শুরু করল আমার দেহে।

অতঃপর গুরুজী নির্দেশিত পন্থায় একটি 'হুং' বীজের চিন্তন করলাম আমার দেহের অনাহত চক্রে এবং আরেকটি 'হুং' বীজের চিন্তন করলাম গুরু দোরজী চ্যাং-এর দিব্যদেহের অনাহত চক্রে। তারপর ধ্যান করতে লাগলাম — গুরু দোরজী চ্যাং-এর অনাহত চক্র থেকে হুং বীজ ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে হতে নীচের দিকে নামছে আর নিজেকে যুক্ত করে নিচ্ছে আমার চেতনসত্তার সাথে। দেখতে দেখতে আমার হৃদয়ের 'হুং' বীজকে উপরপানে টেনে নিতে লাগল গুরু দোরজী চ্যাং-এর হৃদয়ের 'হুং' বীজ। এইসময়ে যত ধ্যানের গভীরে প্রবিষ্ট হতে লাগলাম ততই সেই দিব্যগুরুর সাথে আমার ভিতরকার এক অদ্ভুত সংযোগ অনুভব করতে লাগলাম। গুরুজী বলেছিলেন — এইসময়ে দিব্যগুরুর কৃপালাভের জন্য 'হীগ' শব্দটি প্রতিটি দেহস্থ চক্রে ২১ বার করে জপ করতে হয়। আমি তাই করতে শুরু করলাম। তখনই অনুভব করতে লাগলাম — আমার দেহস্থিত 'হুং' বীজ উঠে গেছে সহস্রারে। তখন 'কা' শব্দ উচ্চারণ করতে করতে এই বীজকে নামিয়ে আনতে লাগলাম একে একে নীচের চক্রগুলিতে। ধীরে ধীরে এই 'হুং' বীজকে আমার দেহের প্রতিটি চক্রে ঘুরিয়ে তা সঁপে দিলাম গুরু দোরজী চ্যাং-এর অনাহত চক্রের মাঝে। তৎক্ষণাৎ গুরু দোরজী চ্যাং-এর থেকে এক প্রবল চৌম্বক শক্তি আমাকে টানতে লাগল তাঁর দিকে। ফলে তাঁর আকর্ষণে আমার স্থূলদেহ ভেদ করে আমার সূক্ষ্মদেহ উঠতে লাগল উপর পানে এবং দেখতে দেখতে তাঁর সাথে মিশে গেলাম আমি। আর তারপর আমাকে নিজের মধ্যে নিয়ে তিনি বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললেন উপরপানে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরই দিগন্তপারে চোখে এল আলোর সমুদ্র। সেই আলোর সমুদ্রের কোথায় যে শুরু আর কোথায় যে শেষ কিছুই বোঝার উপায় নেই। চারিদিকে শুধু আলো

আলো, আর আলো। দেখতে দেখতে সেই আলোর সমুদ্রেই আমাকে নিয়ে মিশে গেলেন গুরু দোরজী চ্যাং। তৎক্ষণাৎ এক অব্যক্ত আনন্দে ভরে উঠলাম আমি। স্পষ্ট অনুভব করলাম — এই জগৎসংসার জুড়ে কোথাও আর কেউ নেই। আছি শুধু আমি, আমি আর আমি। পরব্রহ্মের অনন্ত আলোর সাথে মিশে একাত্ম হয়ে গেছি ; সকল রূপ পেরিয়ে অরূপের মাঝে হারিয়ে গেছি পরমানন্দভরে।" বলতে বলতে লামার মুখচোখ ভরে উঠল এক অপূর্ব আনন্দের আবেশে।

নয়

বেশ কিছুক্ষণ লামা চুপ করে রইলেন। এই অবস্থায় আমিও আর কিছু বললাম না। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম তাঁর এই ভাবাবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। প্রায় আধঘন্টা বাদে তাঁর মুখচোখের ভাব আগের মত অবস্থায় ফিরল। তখন তিনিই নিজে থেকে বললেন, "আর কি শোনা বাকি রইল? আমার সাধনপন্থা তথা জন্ম-মৃত্যুর শৃংখল কেটে বেরোনোর কথা সবই তো বললাম তোমাকে।"

আমি মৃদু হেসে বললাম, "কিন্তু ওই আলোর সমুদ্র থেকে আপনি ফিরে এলেন কিভাবে?"

লামা হাসলেন, "গুরুজীই ফিরিয়ে আনলেন জগৎকল্যাণের কাজে। যে উদ্দেশ্যে আমার পৃথিবীতে আসা তা তো ফো-ওয়া সাধনে সিদ্ধির সাথে সাথেই সাধিত হয়েছে। কিন্তু যোগীদের কাজ তো শুধু ব্যক্তিগত মোক্ষলাভ নয় — এই পথে অন্য সাধকদেরও যে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই জন্ম-মৃত্যুর শৃংখল কেটে বেরোনোর পরও গুরুজী আমায় ফিরিয়ে আনলেন দেহে।"

—"আপনার তখন কিরকম বোধ হচ্ছিল?"

—"সমুদ্রকে একটি পাত্রে ভরতে চাইলে যেমন মনে হওয়ার কথা আমারও তেমনটিই মনে হচ্ছিল। গুরুজীকে তো বলেও ফেললাম, 'বেশ তো মিশে গিয়েছিলাম পরম আলোর সাথে। আমাকে আবার এভাবে ফিরিয়ে আনলেন কেন স্থূলদেহে?'

উত্তরে গুরুজী হাসলেন, 'ওরে, সাধনপথে সিদ্ধির মাধ্যমে তোর দরকার তো মিটেছে। কিন্তু তোর মত দিব্য আত্মাকে যে অনেক সাধকের প্রয়োজন। অনেককে যে পথ দেখাতে হবে তোকে। তাইতো জগৎকল্যাণের ব্রতে তোর প্রয়োজন

অনঃস্বীকার্য্য। সেইজন্যই ফিরিয়ে আনলাম তোকে। তবে এজন্য মন খারাপ করিস না। একবার অনন্তের মাঝে যে মিশে যায় তার অন্তরে তো সেই অনন্তই বিরাজ করে। সেই অসীমের নিত্য সান্নিধ্য থাকার ফলে স্থূলদেহে ফিরেও তোকে আর মায়ার বিকারে পড়তে হবে না কখনো।'

গুরুজীর কথা শুনে আমি বললাম, 'তাহলে এবার আমার জন্য আপনার কি আদেশ?'

গুরুজী বললেন, 'বর্তমানে তোর নিজের জন্য আর কিছুই করণীয় নেই। এবার মানুষের কল্যাণের জন্য তোকে বিজ্ঞানসাধনা শিখতে হবে। সম্প্রতি সাংগ্রীলার কিছু সিদ্ধ গুপ্তযোগীকে সেই সাধনা শেখানোর জন্য জ্ঞানগঞ্জ থেকে সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্মানন্দজী ও জ্ঞানানন্দজী আসছেন। তোকে এবং সাংগ্রীলার আরো কিছু সিদ্ধযোগীকে তাঁদের সান্নিধ্যে থেকে আপন আপন আধার অনুযায়ী এই বিজ্ঞানসাধনার অন্তর্গত সূর্য্যবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, চন্দ্রবিজ্ঞান, জলবিজ্ঞান এবং আকাশবিজ্ঞানের যেকোন একটি শিখতে হবে। আর তারপর তাঁদের সাথে কাজ করতে হবে বিশ্ব জুড়ে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু বিজ্ঞানসাধনা শিখে জগতের কি উপকার হবে?'

গুরুজী বললেন, 'এই বিজ্ঞানসাধনার মাধ্যমে জগৎ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু এই মহাগুপ্তবিদ্যা তো সকলের জন্য নয় — একমাত্র মহাসিদ্ধযোগী এবং অতিসিদ্ধযোগীরাই এই বিজ্ঞানসাধনা শেখার জন্য বিবেচিত হন। এই বিজ্ঞানসকলের মাধ্যমেই জ্ঞানগঞ্জের সিদ্ধযোগীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তোর সৌভাগ্য — এই গুপ্তসাধনার জন্য তোকে তাঁরা মনোনীত করেছেন।' ...।"

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন লামা। বুঝিবা দম নেয়ার জন্যই। কিন্তু আমার যে আর তর সইছে না। এই অবসরে আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে তারপর শুরু হল আপনার বিজ্ঞানসাধনা?"

লামা হাসলেন, "না। তারপর শুধু বিজ্ঞানদীক্ষা হল। সাধন তো শুরু হয়েছে অনেক পরে। তোমার সাথে যেবার কালীঘাটে প্রথম দেখা হল তারপর আমায় বিজ্ঞানসাধনার প্রাথমিক ধাপ শিখিয়েছেন জ্ঞানানন্দজী। তবে সেই বিষয়ে কিছু প্রকাশের অনুমতি নেই।"

—"তাহলে জ্ঞানানন্দজীর সাথে আপনার সাক্ষাতের কথাই কিছু বলুন। অনেকদিন ওঁর কোন খবর পাইনি।"

—"জ্ঞানানন্দজীর মত অতিসিদ্ধ মহাত্মার খবর কি আর এমনিই পাওয়া যায়? তিনি খবর না দিলে কার সাধ্য তাঁর খবর পায়! আমরাও কি আর পেতাম তাঁর খবর? বছর তিনেক আগে কৃপা করে তিনি সাংগ্রীলা মঠে এসেছিলেন বলেই না তাঁর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হয়েছে।"

—"সেদিনকার কথাই একটু বলুন।"

—"সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। হঠাৎই একদিন রাতে আমাদের সাংগ্রীলার মঠাধ্যক্ষ তথা আমার যোগের পথের গুরুজী রেচুং লামা আমি সহ আমাদের মঠের কুড়িজন যোগীকে ধ্যানের মাধ্যমে বার্তা পাঠালেন — পরদিন ভোররাতে তাঁর সাথে সাংগ্রীলা মঠের তোরণদ্বারের সামনে সমবেত হতে। জ্ঞানগঞ্জ থেকে দুইজন মহাত্মা আসবেন। তাঁদের স্বাগত জানাতে হবে। আমরা জানতাম — জ্ঞানগঞ্জ সকল তিব্বতীয় গুপ্তমঠের মধ্যে প্রধানতম মঠ। আর ওখানকার মহাযোগীরাই নিয়ন্ত্রণ করেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু। তাই গুরুজী রেচুং লামার বার্তায় জ্ঞানগঞ্জের উল্লেখ পেয়েই সমস্ত দেহমনে যেন খেলে গেল এক অদ্ভুত শিহরণ। মনে শুরু হল প্রতীক্ষার পালা জ্ঞানগঞ্জের সেই মহাযোগীদের জন্য।

সেইমত পরদিন ভোররাতে আমরা সমবেত হলাম মঠের তোরণের সামনে। সাংগ্রীলা গিরিবর্ত্ম ঘন অন্ধকারে তখন আচ্ছন্ন। মাথার উপর অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারাসকল। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। প্রকৃতির বুকে বিরাজ করছে নিবিড় নিস্তব্ধতা। সহসা আকাশে লক্ষ্য করলাম — দুটি জ্যোতির বিন্দু উল্কাবেগে ছুটে আসছে এদিকেই। দেখতে দেখতে সেই দুটি জ্যোতির বিন্দু এসে স্থির হয়ে থামল আমাদের সামনে। ধীরে ধীরে জ্যোতির বিন্দু দুটি বড় হতে হতে ধারণ করল মানুষের অবয়ব। আর তারপরই সেই অবয়বের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল জ্যোতি। আমাদের সামনে দেখা দিলেন দুই প্রবীণ জটাজুটধারী গেরুয়া পরিহিত মহাত্মা। সবার প্রথমে গুরুজী রেচুং লামা তাঁদের স্বাগত জানালেন নীরবে। তাঁরাও সানন্দে গ্রহণ করলেন গুরুজীর আপ্যায়ন। কেউই কোন কথা বললেন না। শুধু একে অপরের দিকে চেয়ে রইলেন আর মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন। বুঝতে পারলাম — চিন্তাতরঙ্গের ভাষাতেই হয়ে গেল তাঁদের কথা। তাই সেই কথা আমরা

কেউই বুঝতে পারলাম না। অতঃপর আমরা সকলেই তাঁদের তিব্বতী প্রথায় মাথা ঝুঁকিয়ে স্বাগত জানালাম। তাঁরাও সানন্দে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর গুরুজী তাঁদের নিয়ে গেলেন আমাদের মঠের অতিথী নিবাসে। সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হল।

সেই রাতে তাঁদের সাথে কোন কথা হয় নি। কথা হল পরদিন — সেদিনই আমাদের মঠের কুড়িজন যোগী পেলেন বিজ্ঞানদীক্ষা। প্রথম দশজনকে বিজ্ঞানদীক্ষা দিলেন ব্রহ্মানন্দজী আর শেষের দশজনকে দিলেন জ্ঞানানন্দজী। এই শেষোক্ত দশজনের মধ্যেই দশমতম ছিলাম আমি।" এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "বিজ্ঞানদীক্ষা কিরকমভাবে হয়? এটি কি যোগদীক্ষারই মত?"

—"না না। বিজ্ঞানদীক্ষা যোগদীক্ষার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জ্ঞানগঞ্জে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানের সাধনা আছে। সিদ্ধযোগীর আধার অনুযায়ী বিজ্ঞান সাধনা দেয়া হয়। আমার আধার অনুযায়ী আমাকে জ্ঞানানন্দজী দিয়েছিলেন বায়ুবিজ্ঞান।"

—"বায়ুবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া কিরকম?"

—"সেটি বলতে পারব না। নিষেধ আছে। শুধু বলতে পারি — এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে নিজের স্থূলদেহটির সকল উপাদান বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে বায়ুবেগে কোথাও চলে যাওয়া যায়। আবার সেখানে গিয়ে বাতাসের থেকেই আপন দেহের উপাদান আহরণ করে দেহও ধারণ করা যায়। এই বায়ুবিজ্ঞানের মাধ্যমে যেকোন প্রকার সৃষ্টি ও ধ্বংসও সম্ভব।"

—"সেদিনই কি জ্ঞানানন্দজী আপনাকে বায়ুবিজ্ঞানের সকল প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিলেন?"

—"না। আমাদের তিব্বতীয় যোগ বা বিজ্ঞানের প্রতিটি সাধনায় অনেকগুলি করে পর্য্যায় থাকে। একেকটি পর্য্যায়ে সিদ্ধ না হলে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যাওয়া যায় না। বায়ুবিজ্ঞানের এরকম আঠেরোটি স্তর আছে। আমাকে সেদিন প্রথম পর্য্যায়ের সাধনাই শেখালেন তিনি। তবে সেই পর্য্যায়ের সাধনকথা কিছুই বলার আদেশ নেই। জ্ঞানগঞ্জের শ্রেষ্ঠতম মহাত্মা মহাতপাজী যে সেই প্রক্রিয়া কোথাও ব্যক্ত করতে নিষেধ করেছেন সকল দীক্ষিত যোগীকে।"

—"ঠিক আছে। সাধন প্রক্রিয়া বলতে হবে না। কিন্তু সেদিন জ্ঞানানন্দজীর

সাথে কিভাবে আলাপ হল তা তো বলুন। উনি যে আমার খুবই প্রিয় সাধক। তাই ওনার কথা শুনতেও খুব সাধ হচ্ছে।"

—"বুঝেছি আমি। আর উনিও যে তোমাকে খুবই ভালবাসেন খোকাবাবু সেটা সেদিনই বুঝেছিলাম।

যাহোক মূল ঘটনায় ফিরে আসি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যথাসময়ে এই মহাসাধকের ঘরে ডাক পড়ল আমার। সকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলাম আমি। কিন্তু তিনি যে তখন সাংগ্রীলার অন্যান্য সিদ্ধযোগীদের বিজ্ঞানদীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় পেলাম তাঁর ডাক। সেইমত প্রবেশ করলাম তাঁর অতিথী নিবাসের কক্ষে। শান্ত সৌম্য জটাজুটধারী এই সাধক বসেছিলেন ইয়াকের লোমের আসনে। তাঁর সামনেও দেখলাম একটি অনুরূপ আসন পাতা রয়েছে। আমাকে দেখে স্মিত হেসে সেখানেই বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। আমিও সানন্দে বসলাম তাঁর সামনে।

প্রথমেই আমার দিকে একঝলক চাইলেন তিনি। মনে হল — এক অদৃশ্য রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ যেন মুহূর্তের মধ্যেই আমার সবকিছু বিশ্লেষণ করে নিল। তারপর তিনি চিন্তাতরঙ্গের ভাষায় বললেন, 'তোমার যোগসিদ্ধির সাফল্য যে বিজ্ঞানসিদ্ধির পথেও অব্যাহত থাকবে তা বেশ বুঝতে পারছি। রেচুং লামা খুব সুন্দরভাবে তোমাকে গড়ে তুলেছেন।'

আমি বললাম, 'সত্যিই তাই। আমি তো কিছুই ছিলাম না। গুরুজীর কৃতিত্বেই যা কিছু উত্তরণ। সবই তাঁর কৃপা।'

জ্ঞানানন্দজী হাসলেন, 'বাস্তবিকই তাই। গুরুরা শিষ্যকে গড়ে তোলেন নিজের হাতে। তাইতো তাঁরাই হলেন জগতের যথার্থ অভিভাবক। যাঁর মধ্যে সম্ভাবনা দেখেন তাঁকে হাতে ধরে ঘষে-মেজে গড়ে নেন। এই কাজ প্রতিনিয়তঃ আমাদের সকল গুরুকেই করতে হয়। যে গুরু যতজন শিষ্যকে এভাবে ঘষে-মেজে সিদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন তাঁর কৃতিত্ব তত বেশী। কারণ নিজে সিদ্ধ হওয়াই বড় কথা নয় — বাকি মুক্তিকামীদেরও যিনি নিয়ে আসতে পারেন সেই দিগন্তে তাঁরই আসল কৃতিত্ব। সেজন্যই পরমেশ্বর শক্তি সঞ্চার করে দেন গুরুদের মধ্যে যাতে সেই শক্তির আলোয় তাঁরা শিষ্যের মনের অন্ধকার দূর করতে পারেন।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'বিজ্ঞানদীক্ষার প্রাথমিক ধাপ তোমাকে দেখিয়ে দেয়ার পর এ কাজ কিন্তু তোমাকেও করতে হবে।'

—'কিন্তু কিভাবে?'

—'দেখ, এ বিশ্ব নিয়তঃ পরিবর্তনশীল। আর প্রতিটি জীবের মধ্যেই রয়েছে বীজ তার মূল স্বরূপে যাওয়ার জন্য। তবে সব বীজ তো আর নিজে থেকে গাছ হয়ে উঠতে পারে না। বীজের বৃক্ষ হয়ে ওঠার জন্য প্রথমে জমি নির্বাচন করে তাকে কর্ষণ করতে হয়। জমি কর্ষিত হলে তবেই পুঁততে হয় বীজ। বীজ বপনের পর তাকে নিয়মিত পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে হয়। তাই প্রথমে নিজের জমিটিকে কর্ষণ করার দায়িত্ব শিষ্যের থাকে। যে নিজের জমিটিকে কর্ষণ করে যত দ্রুত উপযুক্ত করে তুলবে তত দ্রুত তার কাছে আসবেন গুরু। তারপর তার মধ্যে মন্ত্রের বীজ রোপণ করে তাকে ধীরে ধীরে পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ে যাবেন বৃক্ষের লক্ষ্যে। এটাই সাধনজগতের নিয়ম। জানবে নিজের জন্য সিদ্ধিলাভ যত কঠিন তার চেয়ে শতগুণ কঠিন অপরকে সিদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া। তাই যোগসিদ্ধ যাঁরা হয়েছেন তাঁদের পরবর্তী কাজ হয় অপরের সিদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা। আমাদের জ্ঞানগঞ্জ থেকে এই প্রচেষ্টাই তো করা হয়। আমাদের লক্ষ্য যে জগতের সকল জীবের মুক্তি। কিন্তু সবাই তো মুক্তির জন্য সচেষ্ট নয় — বদ্ধতার লক্ষ্যেই ৯০ ভাগ জীব আবদ্ধ। তবে যে ১০ ভাগ সিদ্ধি বা মুক্তির জন্য সচেষ্ট তাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই আমরা। তাদের দ্রুত সিদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়ে তাদের মাধ্যমে আরো অনেক মানুষকে আমরা আলোর লক্ষ্যে নিয়ে আসি। আর এজন্য বর্তমানে আমরা নিয়েছি এক নতুন কর্মসূচি।'

—'কিরকম?'

—'এই পৃথিবীর বুক থেকে যোগের অনেকগুলি গুপ্ত অধ্যায় লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু এই লুপ্ত অধ্যায়গুলি যোগ্য আধারে ছড়িয়ে দেয়ার বড় প্রয়োজন। তাই বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ১০০ জন নবীন সাধককে আমরা নির্বাচন করেছি। আজ সাংগ্রীলায় তোমাদের যে কুড়িজন সিদ্ধযোগীকে আমরা বিজ্ঞানদীক্ষা দিচ্ছি তার মধ্যে প্রত্যেককে পাঁচজন নবীন সাধকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং এই গুপ্তক্রিয়াগুলি তাদের দান করতে হবে যাতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ক্রিয়াগুলিতে পারদর্শী হয়ে তাঁরা তা আরো অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারে।'

—'তার মানে — আমাকেও এরকম পাঁচ জনের সাথে সংযোগ করতে হবে। কিন্তু এদের পাব কোথায়?'

—'ভারতের পাঁচ দিকে পাঁচজনকে পাবে। পূর্ব ভারতে কলকাতায় একজন, মধ্য ভারতে নর্মদাতটে ওংকারেশ্বরে একজন, দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইতে একজন, পশ্চিম ভারতে খাণ্ডালায় একজন ও উত্তর ভারতে হৃষিকেশে একজন। এঁরা পাঁচজনেই খুব উন্নত আধার ; সেইসাথে প্রচারবিমুখও বটে। এঁদের মধ্যে ক্রিয়াগুলি পড়লে তা তাঁদের মুক্তি এবং তাঁদের মাধ্যমে আরো অনেকের মুক্তির সহায়ক হবে।'

—'কিন্তু এঁদের খুঁজে পাব কিভাবে?'

—'বিজ্ঞানদীক্ষার পর তোমার আজ্ঞাচক্র স্পর্শ করে আমি এই পাঁচজনকেই দেখিয়ে দেব তোমায়। আর কিভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করবে তাও বলে দেব। তবে সেসব পরে বলছি। আগে তোমার বিজ্ঞানদীক্ষা দিয়ে দিই।'

অতঃপর জ্ঞানানন্দজী আমাকে দিলেন বিজ্ঞানদীক্ষা। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে একটি শব্দও আমি বলতে পারব না। কারণ নিষেধ আছে। তাছাড়া সাধনে সম্পূর্ণ সিদ্ধির আগে সিদ্ধির পথের কথা কাউকে বলতেও নেই। আর আমার এখনো বায়ুবিজ্ঞানের শেষ পর্য্যায়ের সাধন প্রাপ্তি বাকি আছে।" এই পর্যন্ত বলে থামলেন লামা।

আমি বললাম, "আপনি আমাকে কৃপা করে যা বললেন তাতেই আমি ধন্য। জ্ঞানানন্দজী তথা জ্ঞানগঞ্জের সাধকরা যে পূর্ব ভারত থেকে আমাকে নির্বাচন করেছেন যোগের এই গুপ্ত অধ্যায়গুলি আয়ত্ত করার জন্য এটা তাঁদের অসীম কৃপা আমার উপর।"

—"অবশ্যই বিরাট কৃপা। কিন্তু এই কৃপার মূল কারণ একা তুমি নও — আরো অনেক ভক্তপ্রাণ। ক্রিয়ার এই গুপ্ত পর্য্যায়গুলি তোমাকে দেয়ায় তা যেমন তোমার সিদ্ধিতে উত্তরণে সহায়ক হয়েছে, তেমনই তা তোমার মাধ্যমে আরো অনেক মানুষকে এগিয়ে দেবে সিদ্ধির দিকে। গুরুজী জ্ঞানানন্দজী যে তোমার মাধ্যমে অনেক মানুষের মাঝে যোগ ও ভক্তির জোয়ার আনতে চান — যে জোয়ার তোমার মত তাদেরও এগিয়ে দেবে আলোর পথে। আর এই কাজে আমাকে যে তিনি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেন এটা আমার প্রতিও তাঁর বিরাট কৃপা।"

—"জ্ঞানানন্দজী কি এখনো সাংগ্রীলাতেই আছেন?"

—"না না। পরের দিনই তিনি ফিরে গিয়েছেন জ্ঞানগঞ্জে ব্রহ্মানন্দজীর সাথে। তিনি তো সাংগ্রীলায় এসেছিলেন দুদিনের জন্য আমাদের কুড়িজনকে বিজ্ঞানসাধনায় দীক্ষা দিতে।"

—"এই বিজ্ঞানসাধনাই তো জ্ঞানগঞ্জের মুখ্য সাধনা। তাই না?"

—"ঠিক তাই। এই বিজ্ঞানসাধনা শুধুমাত্র জ্ঞানগঞ্জেই হয়। তবে বিজ্ঞানসাধনার প্রাথমিক ধাপ অতিক্রম না করলে যে সেখানে যাওয়া যায় না। তাই প্রাথমিক সাধনা আমাদের সাংগ্রীলাতেই করতে হয়েছে। তবে আমার গুরুজী জ্ঞানানন্দজীর সাথে আমার অষ্টপ্রহরই সংযোগ আছে আজ্ঞাচক্রের মাধ্যমে। আমার যখন তাঁকে যা বার্তা পাঠানোর প্রয়োজন এই আজ্ঞাচক্রের মাধ্যমেই পাঠিয়ে দিই। আবার তিনিও আমাকে একইভাবে পাঠিয়ে দেন বার্তার উত্তর।"

—"তাহলে বায়ুবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধাপে আপনি সিদ্ধিলাভ করেছেন?"

—"হ্যাঁ। সেই যে বছর তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় সেই বছরেরই শেষদিকে পেরিয়েছিলাম প্রাথমিক স্তরের বাধা। তারপর দেখতে দেখতে নয়টি পর্য্যায় অতিক্রম করেছি।"

—"জ্ঞানগঞ্জে গেছেন আপনি?"

—"যাব। আগামী পূর্ণিমায় জ্ঞানগঞ্জে আমার যাওয়ার সময় নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমার বিজ্ঞানসাধনার গুরুজী জ্ঞানানন্দজী বলছিলেন — জ্ঞানগঞ্জে যাওয়ার পর দীর্ঘদিন আমাকে সাধনায় থাকতে হবে ওই বাকি ধাপগুলি পেরোনোর জন্য। তাই জ্ঞানগঞ্জে যাবার আগে যেন ভারতের পাঁচটি প্রদেশের যে পাঁচজনকে এই গুপ্ত ক্রিয়াগুলি দিয়েছি তাদের সাথে দেখা করে এই ক্রিয়াতে তাদের অবস্থান জেনে নিই। সেইমত বাকি চারজনের সাথে আগেই দেখা করে তাদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম। আজ তোমার সাথেও দেখা করে নিলাম। দেখলাম — পাঁচজনই এই ক্রিয়ায় সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছে গেছে।"

আমি হাসলাম, "কিন্তু আপনি কি আমার সাথে দেখা করলেন? ঘটনাচক্রে আকস্মিকভাবে আমিই তো এসে পড়লাম আপনার কাছে।"

লামা হাসলেন, "সেটা তোমার মত খোকাবাবু। কারণ — তুমি তেমনটাই দেখেছ। আর যেটা দেখনি সেটা হল — এই পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে কিছুই ঘটে না। যা ঘটে সবই থাকে পূর্ব নির্দ্ধারিত। তুমি জান না বলে ভাবছ — এখানে এসে পড়েছ ঘটনাচক্রে আর তাই আমার সাথে তোমার দেখা হয়েছে। কিন্তু যোগসিদ্ধির পর আমি যে ত্রিকালজ্ঞ হয়ে গেছি। তাই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাচক্রই স্পষ্ট দেখতে পাই চোখের সামনে। তাইতো আমি জানতাম —

আজ এই পথে লামা আংডেন শিখরের দিকে তুমি আসছ আর এই পথে আকস্মিকভাবেই আসবে ঝড় এবং তাতে পথ ভুল করে এই গুহাতেই তুমি এসে উঠবে। তাইতো তোমার আগেই এখানে আবির্ভূত হয়ে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।"

আমি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। সত্যিই তো! আমি যখন গুহায় প্রবেশ করেছিলাম লামা তো তখন আমার দিকে না চেয়েই চোখ বন্ধ অবস্থায় আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আমার আসার সংবাদ ওনার জানা না থাকলে কি এমনটি হতে পারত!

লামা এবার মৃদু হেসে বললেন, "বুঝেছ তো খোকাবাবু, আজকে আমাদের এই যোগাযোগ মোটেই আকস্মিক নয় — সম্পূর্ণভাবেই পূর্বনির্দ্ধারিত। শুধু তুমি জানতে না আর আমি জানতাম এই যা পার্থক্য। বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে আকস্মিক বলে ঘটে না কোন ঘটনা। যা ঘটে সবই পূর্বনির্দিষ্ট। আমরা যোগীরা শুধু সাধনবলে সেটি আগে থেকেই জানতে পারি।" এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন লামা। এইসময়েই তাঁর চোখ পড়ল বাইরের দিকে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, "খোকাবাবু, আর দেরী কোর না। বাইরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। এবার বেরিয়ে পড়। গতরাতে পথ ভুল করে তুমি অন্যদিকে চলে এসেছিলে। তাই গন্তব্যে যেতে হলে আজ ওই পথেই অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে তোমায়। পিছিয়ে গিয়ে বাঁদিকের বাঁকটি নিলেই পৌঁছে যাবে তোমার লামা আংডেন ক্যাম্পের মূল পথে।"

লামার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর পাশে শুয়ে থাকা সাপটি ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গুহার মুখের দিকে। সেদিকে চেয়ে লামা হাসলেন। বললেন, "দ্যাখো, আমার সেবকটি সাপ হলেও কতটা সহবোধ জানে। তোমাকে গুহামুখ অবধি এগিয়ে দিচ্ছে কেমন সুন্দরভাবে।"

লামার ইঙ্গিতটি বুঝতে অসুবিধা হল না। এবার আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। যোগীদের কাছে যে সময়ের বিরাট মূল্য। কাজ শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করেন না তাঁরা। আমার অবশ্য লামার সান্নিধ্য ছেড়ে বেরোনোর এতটুকুও ইচ্ছা নেই। যদিও sight scene লামা আংডেনে প্রকৃতির মনমুগ্ধকর অপার সৌন্দর্য্যের বিস্তার দেখার জন্যই আমার এদিকে আসা, কিন্তু এমন দৃশ্য তো কতই দেখেছি এবং পরেও কতই দেখব। তবে গতরাত থেকে এই মহাত্মা লামার সান্নিধ্যে

যেভাবে তিব্বতের গুপ্তমঠ সাংগ্রীলার সাধনরহস্যে সমৃদ্ধ হলাম তার চেয়ে বড় প্রাপ্তি তো কিছু হতে পারে না। কোহিনুর হাতে পেলে জাগতিক মন যেমন ছোট হীরেয় ভোলে না, তেমনই লামার সান্নিধ্যলাভের পর লামা আংডেন ক্যাম্পের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যাবতীয় আকর্ষণই যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি মনে হল। আসলে পার্থিব বস্তুতে তো সত্যিকারের সুখ নেই ; অজ্ঞানের বশেই পার্থিব বস্তু থেকে আমরা সুখ আহরণের চেষ্টা করি। সত্যিকারের সুখ তো রয়েছে এরকম অপার্থিব মহাত্মাদের সান্নিধ্যে যা দেখায় জীবন থেকে মহাজীবনের পথ। তাই মন চাইছিল — যে লামার সান্নিধ্যে এমন অমৃতধারায় স্নাত হলাম আমি তাঁর চরণ আঁকড়েই পড়ে থাকি। কিন্তু মন যা চায় তা তো হয় না। কর্তব্যের টানে সকলকেই ফিরে যেতে হয় আপন আপন পথে। সাথে শুধু থেকে যায় ফেলে আসা মুহূর্তের সোনালী স্মৃতি।

অতএব লামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম। তিনিও সস্নেহে মৃদু হেসে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, "তোমাকে কল্যাণ হোক বলতাম। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমার কল্যাণ তো হয়েই গেছে। এবার তোমার মাধ্যমে জগতের কল্যাণ হোক — এই আশীর্বাদই করি। সত্যি বলতে কি, এ জগতে আমাদের নিজের বলতে কিছুই নেই। আমাদের জিনিষপত্র, জামাকাপড়, টাকাপয়সা সবই পার্থিব বস্তু — এগুলি আমাদের কোনদিনই ছিল না। জীবনের নানা সুখদুঃখের ঘটনার স্মৃতি শুধুই সময়ের সম্পদ। আমাদের প্রতিভাও শুধুই পরিস্থিতির অবদান মাত্র। যে শরীরটা আমরা অবলম্বন করে থাকি তাও পঞ্চভূতের সম্পদ। এমনকি আমাদের আত্মাও আমাদের নিজের নয় — তাও পরমাত্মার দেয়া দুদিনের উপহার। তাই জানবে — এ পৃথিবীতে আমাদের নিজের বলে কিছুই নেই। হাতে আছে শুধুই এই পৃথিবীতে কাটানোর জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত মুহূর্তগুলি। এই মুহূর্তগুলি সত্যিকারের কাজে লাগানোর মাঝেই জীবনের পূর্ণতা। আর সত্যিকারের কাজ হল নিজ মুক্তির জন্য চেষ্টা করা এবং সেইসাথে অন্য ভক্তদেরও সত্যিকারের পথের দিশা দেখানো — তাদের অধ্যাত্মপথে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই তোমায় আশীর্বাদ করি — জগতের অধ্যাত্মতৃষ্ণা মিটুক তোমার মাধ্যমে ; সবার কল্যাণ হোক। শুভমস্তু।"

আমি বললাম, "আর কি আপনার দেখা পাব না?"

লামা হাসলেন, "পাবে বৈকি। সাক্ষাতে না হলেও আজ্ঞাচক্রের সংযোগে যথাসময়ে আবার আমাদের কথা হবে। সামনে যে তোমার জগৎব্যাপী কাজ। সেই কাজে আমারও তো ভূমিকা আছে। তাই আমিই বা তোমার থেকে দূরে থাকব কিভাবে?" তারপর একটু থেমে বললেন, "এবার এস তুমি। অমৃতের পথে তোমার যাত্রা সার্থক হোক।" এই পর্যন্ত বলেই চোখ বুজলেন লামা। বুঝলাম — এই মহাসাধক আমাকে বিদায় জানিয়েই বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সমাধিতে ডুবে গেলেন।

অতএব উঠে দাঁড়ালাম। অগ্রসর হলাম গুহামুখের দিকে। গুহার মুখে থেকে বুঝিবা আমার যাওয়ার প্রতীক্ষাই করছিল লামার সেবক সাপটি। কারণ আমি গুহা থেকে বেরোতেই সাপটি আবার ধীরে ধীরে ফিরে গেল সমাধিস্থ লামার পাশে।

বাইরে এসে দেখি — সারারাতের তুষারপাতে সমস্ত পথ তুষারে ছেয়ে গেছে। আশেপাশের পাইন, ফার, বার্চ গাছের উপরেও পড়েছে তুহিনশীতল তুষারের প্রলেপ। নতুন সূর্য্যের আলো এই তুষারে ছাওয়া পার্বত্য পথে ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের বার্তা।

গতরাতে পথ ভুল করে এদিকে চলে এসেছিলাম। তাই সেই পথেই অগ্রসর হলাম প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে। লামা যে বলেছিলেন — যে পথ ধরে এখানে এসে পড়েছি সেই পথে অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ার পর বাঁদিকে বাঁক নিতে হবে ; তবেই না পৌঁছব লামা আংডেনের মূল পথে।

অতএব এগিয়ে চললাম আমি জাগতিক পৃথিবীর সেই নতুন পথের দিকে। কিন্তু মন পড়ে রইল ওই পিছনে ফেলে আসা গুহার মাঝে — লামার শ্রীচরণে। আর মন জুড়ে রইল সারারাত ধরে লামার সান্নিধ্যের স্মৃতি। জীবনপথে চলতে চলতে এমন অপার্থিব প্রাপ্তি তো বড় বেশী হয় না। তাই প্রাপ্তির স্মৃতিতে মন ভরিয়ে আমার আত্মা বারবার ফিরে চাইছে পিছনপানে। কিন্তু মন স্মৃতির পিছুটানে ধরা দিলেও আমাদের যে এগিয়ে যেতেই হয় সামনের দিকে। পথ চলা তো থামানো যায় না। এই পথ চলার জন্যই তো স্থূলদেহ ধারণ করে দুদিনের খেলাঘর এই পৃথিবীতে আসা। চলতে চলতে যেসব আধ্যাত্মিক মণিমুক্তো পথে কুড়িয়ে পাই সেসব বুকে নিয়েই যে এগিয়ে চলি সামনের দিকে। আজো হল না তার ব্যতিক্রম। এই তুষারে ছাওয়া পার্বত্যপথে লামার থেকে পাওয়া মহাজীবনের অমৃতে মন রাঙিয়ে এগিয়ে চললাম আমি নতুন দিশার পানে।